ত্রিধারা।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

যাদু !

তুমি পড়িবে বলিয়া যে প্রবন্ধটি দিলাম সেই প্রবন্ধটি একবার পড়িও। আমি সুখী হইব।

এখন কোথায় আছ ঠিক জানি না। যেখানেই থাক, আশীর্ব্বাদ করি এবার দীর্ঘজীবী হইও।

কলিকাতা।
[illegible]নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
১১ই মাঘ, ১২৯৭ সাল।

সূচীপত্র।

প্রথম ধারা।

দ্বিতীয় ধারা।

তৃতীয় ধারা।

পরিশিষ্ট।

প্রথম ধারা।

অনন্ত মুহূর্ত্ত।

কালের গতি অবিরাম। কাল কেবল চলিতেছে। কবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেহ জানে না, কেহ কহিতে পারে না। কিন্তু সকলেই দেখে চলিতেছে—কেবলই চলিতেছে। আবার শুধু চলিতেছে?—ভীষণ বেগে চলিতেছে!

কাল চলিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে—অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে লইয়া কাল চলিতেছে। যেন কালের বেগে বেগপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভীষণ বেগে চলিতেছে! একবার যে এক জায়গায় দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিব কাল কেমন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন, তাহার যো নাই। দাঁড়াইব কেমন করিয়া—আমিও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে চলিতেছি। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাই, আর কত কি দেখি। কিন্তু হায়! এই মাত্র যাহা দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে পাই না—কালের ভীষণ স্রোতে তাহা কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাই না, আমিই বা কোথায় চলিয়া আসিলাম বুঝিতে পারি না! অতএব কালও দেখিতে পাই না, কালস্রোতে প্রবাহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে পাই না! বড়ই দুঃখ—ক্ষোভের সীমা নাই!

কবি বলেন ক্ষোভ করিও না—তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইব। দেখ দেখি—

ত্রিধারা।

পৃথিবীর ঐ মধ্য প্রদেশে—যথায় প্রকৃতির সমস্ত অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, প্রজ্বলিত—কেমন একটি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুগভীর সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে! সরোবরে তরঙ্গ নাই—কেবল মাত্র উহার জল একটু উষ্ণ। উহা এত গভীর, কিন্তু উহার তলদেশ পর্য্যন্ত যেন চক্ষের নিকটেই পড়িয়া রহিয়াছে। উহার তলদেশে পাঁক কি কর্দ্দম কি বালুকা কিছুই দৃষ্ট হয় না—দৃষ্ট হয় কেবল ঐ উচ্চ উষ্ণ আলোকময় দীপ্তিপূর্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূরসদৃশ ঘোরতর অনুরাগ।—ভ্রম হয়, ঐ সিন্দূর-সম অনুরাগ আকাশে না সরোবরে।

অমন অনেক দেখিয়াছ—কিন্তু এমন দেখিয়াছ কি?—

ঐ উচ্চ উষ্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূররাগ ঘুচিয়া গিয়াছে—যেখানে সিন্দূররাগ ছিল, সেখানে এখন মেঘরাশিতে যেন আগুন লাগিয়াছে—ঝড়ে সেই জ্বলন্ত মেঘরাশি ভীষণভাবে ভীষণ বেগে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মারামারি করিতেছে। কিন্তু সেই সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর তেমনি স্থির—উহাতে একটি তরঙ্গ নাই, উহার জলের এতটুকু আন্দোলন নাই, উহার বারিরাশি যেন ঐ উন্মত্ত জ্বলন্ত মেঘরাশি বুকে করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তেমনি নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ!

বল দেখি এ-তুফানের এই-সরোবর যে দেখে সে আর উহা ভুলিতে পারে কি—পৃথিবী দেখিলে পৃথিবী আর উহা ভুলিতে পারে কি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর উহা ভুলিতে পারেকি? বল দেখি—এ-তুফানের এ-সরোবর যে দেখে, সে উহা অনন্ত কাল দেখে কি না? বল দেখি, এই মুহূর্ত্তের এই সরোবর অনন্ত কাল কি না? বল দেখি- এই মুহূর্ত্তে অনন্ত কাল

প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না—কালের অনন্ত স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না—যে কাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া কেবলই চলে, সে কাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া একবার অনন্ত কালের জন্য দাঁড়াইয়াছে কি না? বল দেখি—এই মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত কি না? এখন শুন—

Desdemona. Cousin, there's fallen between
him and my lord
An unkind breach : but you shall make all well.
Othello. Are you sure of that ?
Des. My lord ?
Oth. *This fail you not to do, as you will*—[*Reads.*
Lodovico. He did not call ; he's busy in the paper.
Is there division 'twixt thy lord and Cassio ?
Des. A most unhappy one ; I would do much
To atone them, for the love I bear to Cassio.
Oth. Fire and brimstone !
Des. My lord ?
Oth. Are you wise ?
Des. What, is he angry ?
Lod. 'May be, the letter mov'd him,
For, as I think, they do command him home,
Deputing Cassio in his government.
Des. By my troth, I am glad on't.
Oth. Indeed ?
Des. My lord ?
Oth. Devil ! [*Striking her.*
Des. I have not deserv'd this.
Lod. My lord, this would not be believ'd in
Venice,

Though I should swear I saw it ;'Tis very much ;
Make her amends, she weeps.
Oth. O devil, devil !
If that the earth could teem with woman's tears,
Each drop she falls would prove a crocodile :—
Out of my sight !
Des. I will not stay to offend you.
[*Going*.

"I will not stay to offend you"—ইহাতেই তুফানের সেই অপূর্ব্ব সরোবর—ইহাই সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত।

আর এক জন কবি কি দেখাইতেছেন দেখ দেখি—

অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচলের কোলে শান্ত শব্দহীন সৌন্দর্য্য-ময় বনপ্রদেশ। তথায় স্বচ্ছ শুভ্রসলিলা মালিনী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিতা—মালিনীর পার্শ্বে পুণ্যবান্ ঋষির পবিত্র আশ্রম। আশ্রম নিস্তব্ধ—যেন যোগীর ন্যায় যোগমগ্ন। হঠাৎ বিদ্যুদ্-বৎ বজ্রধ্বনি হইল—

অয়মহং ভোঃ

হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, পশু, পক্ষী, ঋষি, ঋষি-কুমার, ঋষিকন্যা, সেই গভীর নিস্তব্ধতা—সকলই চমকিয়া উঠিল। কেবল চমকিল না—একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা!

দেখিয়া বজ্রের ক্রোধ বাড়িল। বজ্র হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া গর্জ্জিতে লাগিল—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥

সব বিদীর্ণ হইল—হইল না কেবল সেই ক্ষুদ্র কুটীরে সেই ক্ষুদ্র বালিকা! বালিকা তখন ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বিলীন। বজ্রও সে বিলীনতা বিদীর্ণ করিতে পারিল না। বালিকা যেমন তাহার ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন, বজ্রও তেমনি সেই বালিকার বিলীনতায় বিলীন হইয়া গেল!

বল দেখি—বালিকার এই বিলীনতায় বজ্রের এই বিলীনতা দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সংযুক্ত বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না—যে কাল কেবলই চলে, সেই কাল সেই বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না? বল দেখি—যে মুহূর্ত্তে বালিকার এই বিলীনতায় এই ভীষণ বজ্রকে বিলীন হইতে দেখি, সে মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া যায় কি না?

সেই কবি সীতা দেবীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছেন শুন—

সীতা নিতান্তই রাম-লইয়া—সীতা নিতান্তই রাম-সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই সীতা ছায়ার ন্যায় রামের অনুগামিনী—যেখানে রাম, সেইখানেই সীতা—দুঃখ কষ্ট বিপদ, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—রাজপুরী তুচ্ছ করিয়া সীতা অরণ্যবাসিনী, অশোকবনে বসিয়া সীতা দুর্দ্ধর্ব রাক্ষসকুলবিনাশিনী। রাম ব্যতীত সীতা জীবন্মৃতা—রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রামমাত্র সার। তাই রামের জন্য সীতা ত্রিলোকসমীপে অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছেন—তাই আবার হৃদয়ে রামকে ধরিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া বনবাসযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। আজ আবার সর্ব্বলোকসমক্ষে রাম বলিতেছেন—

পরীক্ষা দেও। এতও কি সয়? সীতার আর সহিল না! তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি হৃদয় সকলই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি, তবে দেবি বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' সীতা পতি হইতে বিচলিত হন নাই, কিন্তু আজ দেবতাদের নিকট যাহা চাহিতেছেন তাহা পাইলে তিনি যে তাঁহার সেই পতিকে হারাইবেন, সেই পতিকে যে দেখিতে পাইবেন না,সে জ্ঞান তাঁহার গিয়াছে। ফলে, আজ সীতারূপী ব্রহ্মাণ্ড মেরুদণ্ড হারাইয়া দিক-হারা, পথ-হারা, আপন-হারা। তবুও কিন্তু ব্রহ্ম-হারা নয়!

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ ॥

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম, "না" "না," ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

"তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!" ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবুও ব্রহ্মাণ্ড আপন ব্রহ্মকে আগেও যেমন এখনও তেমনি হৃদয় ভরিয়া ধরিয়া রহিয়াছে! এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল স্তম্ভিত—মহাকাল বিস্ময়ে অচল। এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

আর একজন কবি কি কহিতেছেন শুন দেখি—

একটি কাল ছোট সুন্দর মেয়ে—নাম ভ্রমর। ভ্রমরটি এমনি ছোট যে বোধ হয় যেন একটি অঙ্গুলির টিপ নিতেই মরিয়া

যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের ক্ষুদ্র প্রাণে প্রেমের সমুদ্র—অনন্ত, অতলস্পর্শ। সে সমুদ্রের যেখানে খোঁজ—দেখিবে কেবল গোবিন্দলাল। কিন্তু গোবিন্দলাল পাপী। তাই এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের তেজ সিংহ শার্দ্দূলের তেজ অপেক্ষাও বেশি। গোবিন্দলাল মুষ্টিভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে—বলিলে তখন সে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে, পণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে। তবুও ত রাগ পড়িল না—তেজ কমিল না। এত তেজ এত রাগ দেখিলে যেন রাগ হয়।

কিন্তু ইহা বা কি দেখিলে? দেখিবে ত এইবার দেখ। ক্ষুদ্র ভ্রমরের অন্তিমকাল উপস্থিত। ভ্রমর এখন গোবিন্দলালের জন্য লালায়িত—একটিবার মাত্র গোবিন্দলালকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। গোবিন্দলাল দেখা দিতে আসিয়াছে—আপনি আসে নাই, ডাকিয়া আনিয়াছে তাই আসিয়াছে। ভ্রমর সে কথা শুনিয়াছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমরের মৃত্যুযন্ত্রণা ঘুচিয়া গেল—ভ্রমরের সাত বৎসরের হৃদয়াগ্নি নিভিয়া গেল—ভ্রমরের ইহকাল পরকাল সার্থক হইল। তবুও ভ্রমর বলিল—'আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই'—বলিয়া ভ্রমর মরিয়া গেল! ভ্রমরের উপর এত যে রাগ হইয়াছিল তাহা কোথায় চলিয়া গেল। ভ্রমরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়ে যত দুঃখ উপজিল, হৃদয় তাহার সহস্রগুণ বিস্ময়ে পূরিয়া উঠিল। যে গোবিন্দলালকে না দেখিতে পাইয়া ভ্রমর আজ মৃত্যুশয্যায়, সেই গোবিন্দলালকে এ-হেন মৃত্যু-মুহূর্ত্তে ইহজন্মের মতন একটিবার দেখিতে পাইয়াও ভ্রমর বলিল কি না—'যেন জন্মান্তরে সুখী হই'! এ সেই আগেকার মতন কাটা কাটা

কথা নয় বটে, এ কাতরতার কথা। কিন্তু ইহাতেও ত সেই আগেকার তেজ, আগেকার কঠোরতা আছে। এ কথা শুনিলে কান্না পায় বটে, কিন্তু এ কথাও যে পাপীর কাছে তাহার পাপের কথা—পাপীর প্রতি পাপের জন্য তিরস্কারের কথা। মিছরির ছুরি যাহাকে বলে, এ কথা যে তাহাই। ভ্রমরের সব ভাঙ্গিয়াছে—অস্থি, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, দেহ, মন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু সে গোবিন্দলালও ভাঙ্গে নাই, আর গোবিন্দলালের প্রতি সে কঠোরতাও ভাঙ্গে নাই! বল দেখি—এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া যায় কি না, মহাকাল থমকিয়া দাঁড়ায় কি না? এখন বুঝিলাম ভ্রমরের রাগ, ভ্রমরের তেজ—দর্পও নয়, অহঙ্কারও নয়, প্রেমের অভিমান ও পুণ্যের কঠোরতা। আর সে অভিমান কি?—না, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না বলিয়া, ভালবাসার পাত্রকে পাপ স্পর্শ করিল বলিয়া মরমের যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা কিছুতেই ঘুচে না, ঘুচে কেবল অসম্পূর্ণকে পূর্ণ দেখিলে—পাপীকে নিষ্পাপ দেখিলে। তাই, গোবিন্দলাল অসম্পূর্ণ বলিয়া, মরিতে মরিতে ও ভ্রমর তাহার প্রতি তেমনি কঠোর। পুণ্যের কঠোরতা বিষম কঠোরতা—এতটুকু অসম্পূর্ণতা থাকিতে পুণ্যের কঠোরতা যায় না। পুণ্য দেয়ও ষোল আনা, চায়ও ষোল আনা, কাগক্রান্তিটিও ছাড়ে না। লেশমাত্র পাপ বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে প্রেমময় ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভ্রমরের এই বিষম কঠোরতা সেই প্রেমময়ের কঠোরতা। কিন্তু সে কঠোরতা কেবলই কঠোর নয়—সে কঠোরতা করুণে-কঠোর। অসম্পূর্ণতা যন্ত্রণার কারণ বলিয়া পুণ্য অসম্পূর্ণতার প্রতি এত কঠোর। পুণ্যের কঠো-

রতা করুণে-কঠোর। তাই আজ পুণ্যবতী গোবিন্দলালকে আপনার যন্ত্রণার কথা বলিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। ধর্ম্ম বুক খুলিয়া আপন যন্ত্রণা দেখাইয়া বলিয়া গেল, পৃথিবীর যন্ত্রণা ঘুচাইও—পূর্ণ হইবে ও পূজ্য হইবে। তাই দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল বিস্মিত ও ভক্তি-পূর্ণ চিত্তে সাশ্রু নয়নে ভ্রমরের পূজা করিল আর স্বয়ং কাল যেন তাহা দেখিবার জন্য অনন্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল! ভ্রমরের ঐ মৃত্যু-মুহূর্ত্ত সত্যই একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

এইরূপে আমাদের কবিগণ কালের গতি রোধ করেন এবং অনন্ত কালকে মুহূর্ত্ত কালে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কালের ভঙ্গি ভ্রূকুটী আদি নষ্ট করিয়াই তাঁহারা কালকে বাঁধিয়া ফেলেন। তাঁহারা দেখেন যে ঈশ্বরের কাছে কালের ভ্রূকুটী ভঙ্গি কিছুই নাই—ঈশ্বর অনন্তকালেও যা মুহূর্ত্ত কালেও তাই।—ঈশ্বর অনন্ত মুহূর্ত্ত। সেই চরমাদর্শ শিরোপরি রাখিয়া তাঁহারা সাহিত্যে অনন্ত মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করেন—বুঝি বা তাঁহাদের ইচ্ছা যে মানুষ যেন এতই উচ্চ, এতই ঈশ্বর-সদৃশ হয় যে কালে তাহার বিপর্য্যয় না ঘটে, আর যখনি তাহাকে দেখা যায় তখনি তাহাকে যেন পূর্ণ দেখা যায়—তখনি যেন তাহার সমস্তটা দেখা যায়। কবির সাহিত্য বড় জিনিস। কবির কাহিনী বড়ই গূঢ়। ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির উপাসক না হইলে কবির সাহিত্য, কবির কাহিনী বুঝা ভার।

পাখিটি কোথায় গেল ?

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন?' সে বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?' আমি কখনও পাখী পুষি নাই। পাখী পুষিতে কখনও সাধও হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড়ই ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখনও পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?'—কি জানি কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল, মনে হইল বুঝি আমি পাখিটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কতই কষ্ট দিবে—পাখিটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব-আনন্দভরে পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—আবার অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব-আনন্দভরে তাহাকে আরো কত কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তায় আবার দেখিলাম যে পাখিটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে জড়সড় হইয়াছে, বুঝিবা কতই আকুল হইয়াছে, বুঝিবা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে!

বড় দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—পুষিব। মানুষটি বলিল, আটটি পয়সা পাইলেই পাখীটি দি। পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎ-ক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং এক প্রতি-বাসীর নিকট হইতে একটা খাঁচা লইয়া পাখীটিকে তাহাতে রাখিয়া দুগ্ধ ছাতু ও জল খাইতে দিলাম। দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তবু পাখীটি খাইল না। অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে আস্তে আস্তে ধুঁকিতে লাগিল। মনে হইল বুঝি আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়া ভয়ে খাইতেছে না। একটু সরিয়া গেলাম। পাখীটি আমাকে আর দেখিতে পাইল না। খানিক পরেই একটু ছাতু ও জল খাইল। আমি বুঝিলাম—আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিয়াই এতক্ষণ খায় নাই। কিন্তু দুষ্‌মুনের ঘরে দুষ্‌মুনের সামগ্রী খাইল ত। আমি তাহার এত সুখ এত সামগ্রী হরণ করিয়াছি —কিন্তু আমার ঘরে আমার জিনিস খাইল ত। পেটের দায় এমনি দায়। পেটের মতন যন্ত্রণা জগতে আর নাই—পেটই ত জগতে এত কলঙ্কের মূল। আমার পাখী পেটের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারিল না—পেটের জন্য দুষ্‌মুনের জিনিস খাইয়া কলঙ্কে ডুবিল। বুঝিলাম আমাদের ন্যায় পাখীও ক্ষুদ্র, পাখীও দুর্ব্বল। পাখীর উপর মায়া হইল। সে দিন আর পাখীর কাছে গেলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি পাখী দিব্য খাওয়া-দাওয়া করিয়াছে। ছাতুর বাটিতে ছাতু প্রায় নাই, জলের বাটিতে জলও কিছু কম এবং খাঁচার নীচে মেজের উপর কিছু ছাতুর গুড়া এবং দুই চারি ফোঁটা জল পড়িয়া আছে। বড়

আহ্লাদ হইল। পাখীর কাছে গেলাম। পাখী সরিয়া খাঁচার এক কোনে গিয়া বসিল। প্রায় এক ঘন্টা কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাখীও সেই এক ঘন্টা কাল সেই কোণে বসিয়া রহিল কিছু খাইল না। আমি সরিয়া আসিলাম—পাখীও খাইতে লাগিল। তখন আবার ভাবিলাম—পাখী আমাকে এখনও দুষ্‌মুন ভাবিয়া খাইতেছে না। ভাল, এমন করিয়া খাওয়াইতেছি তবুও পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিতেছে? ভাবিবে না ত কি? সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল পেটে খাইতে দিতেছি বলিয়া কি সে আমাকে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিবে? পেটটা কি এতই বড়? তবে কেন পাখী আমাকে দুষ্‌মুন ভাবিবে না? কিন্তু দুষ্‌মন হই আর যাই হই, আমি পাখীকে পয়সা দিয়া কিনিয়াছি ত বটে; তবে কেন পাখী আমার হয় না? মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের হয়; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের মন যোগায়, গোলামি করে, গুণগান করে, সবই করে; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষকে গতর দেয়, মানমর্য্যাদা দেয়, পুণ্যধর্ম্ম দেয়, সব দেয়। পাখীকে পয়সা দিয়া কিনিলাম তবে কেন পাখী আমার হয় না, আমাকে কিছু দেয় না? কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। বোধ হইল বুঝি পাখী নীচ জন্তু, পয়সার মাহাত্ম্য জানে না, পয়সার জন্য সব করা যায় সব দেওয়া যায়, এ উচ্চ মানব-নীতি বুঝিতে পারে না। আরো দুই চারি দিন গেল। আবার একবার পাখীর কাছে গেলাম। দেখি সেখানে আমার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে। পাখী আমাকে দেখিয়া আর তেমন করিয়া সরিয়া গেল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া

আমি তাহার সহিত পাখীর কথা কহিতে লাগিলাম। পাখী খাইতে লাগিল। বুঝিলাম পাখী খাঁচা চিনিয়াছে। মনে দুঃখ উথলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া উঠিয়া নামিয়া নামিয়া যার আশ্ মিটে না, কেন তাহাকে, হায়! হায়! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলাম! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচা চিনাইলাম! কেন তাহাকে অনন্ত ভুলাইলাম! এ মহাপাতক কেন করিলাম! দুই এক দিন বড়ই কষ্টে গেল। এক একবার মনে হইতে লাগিল পাখীকে উড়াইয়া দি। একবার খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়া একটা জানালার উপর বসিল। আবার মনটা কেমন করিতে লাগিল—পাখী পালায় ভাবিয়া প্রাণটা কেমন হইয়া গেল—অমনি পাখীকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলাম। আপনার কাছে আপনি হারিলাম। কেন হারিলাম বুঝিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই কি মহাপাতক করিলাম?

এক দিন ছেলেগুলিকে লইয়া পাখীর কাছে বসিলাম। পাখী যেন কতই আহ্লাদিত হইয়া খাঁচার ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল এবং একবার এ ছেলেটির দিকে একবার ও ছেলেটির দিকে যাইতে লাগিল। আমরা সকলে আহ্লাদে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং করতালি দিতে লাগিলাম। পাখী ভয় পাইল না—তেমনি লাফালাফি করিতে লাগিল। আমি একটু ছাতু লইয়া পাখীকে খাইতে দিলাম—পাখী খাইল না। আমার একটি ছেলে একটু ছাতু লইয়া খাইতে দিল, পাখী টুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মনে হইল আমার ছেলেগুলির সহিত পাখীর ভ্রাতৃভাব হইয়াছে—ছেলে-

গুলিকে বলিলাম, উটি তোমাদের ভাই। সেই দিন হইতে পাখীটিও আমার ছেলে হইল। পাখীটিকে আমার হৃদয়ের খাঁচায় পুরিলাম। সে খাঁচার সীমা নাই, অর্গলযুক্ত দ্বার নাই, আশে পাশে মাথায় পায় ঠেকে এমন কাটির কাঠাম নাই। পাখীকে সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ খাঁচায় পুরিলাম। মহা-পাতকের ভয় কোথায় চলিয়া গেল। মন আনন্দে মজিয়া উঠিল। পাখীও আর তাহার বাঁশের খাঁচায় এখানে ওখানে ঠোঁট গলাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে না। এখন বাঁশের খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখি, পাখী উড়িয়া যায় না। খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখিলে পাখী এক আধবার আমার কাছে আসে, এক আধবার আমার ছেলেদের কাছে আসে। আবার নাচিতে নাচিতে খাঁচার ভিতর গিয়া বসে। খাঁচা এখন পাখীকে বড় মিষ্ট লাগে। খাঁচার এখন আর সীমা নাই, খাঁচা এখন অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ। খাঁচার এখন আর কাটির কাঠাম নাই—আশে পাশে মাথায় পায় লাগে এমন কাটির বেড়া নাই। খাঁচা এখন পাখীর বড় সখের বড় সাধের ঘর। পাখী এখন খাঁচার নেশায় ভোর। আমি এখন পাখীর সহিত কত কথা কই, পাখীও আমার সহিত কত কথা কয়—যেন কত আদরের, কত আব্‌দারের কথা কয়, কত চেনা দেশের কথা কয়, কত অচেনা দেশের কথা কয়, কত হাসে, কত কাঁদে, কত গান গায়, কত বকে, কত ঝগড়া করে, কত অভিমান করে, কত ভাব করে,কত ভ্রুকুটি করে, কত ভণ্ডামি করে। পাখীকে আমি কত রকম করিয়া দেখি, পাখীও আমাকে কত রকম করিয়া দেখে। পাখীর খাঁচা খুলিয়া দি। পাখী আসিয়া আমার কাঁধের উপরে বসে, আমার

হাতের উপর বসিয়া ছাতু খায়। আমি এখন আর পাখীর সে তুষ্ মুন নই। আমি এখন পাখীতে মজিয়াছি, পাখীও এখন আমাতে মজিয়াছে। এখন অনন্ত আকাশ হৃদয়ের অনন্তত্বে ডুবিয়া গিয়াছে—পাখী এখন আর অনন্ত আকাশ খোঁজে না, তাহার অনন্ত-আকাশের তৃষ্ণা আর নাই। সে এখন আকা-শের অনন্তত্ব ভুলিয়া হৃদয়ের অনন্তত্বে মিলাইয়া গিয়াছে। অনন্ত-বিশ্ব হৃদয়ের ভিতর বিন্দু অপেক্ষাও বিন্দু। বিশ্ববিন্দু হৃদয়ের কাছে কোন্ ছার? কিন্তু হৃদয়ের ভিতর অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত হৃদয়। হৃদয় বিশ্ব-দ্রাবক, বিশ্বের বিশ্ব। আমার পাখী সেই বিশ্বের বিশ্বে পশিয়াছে। তাহার কি আর সেই তুচ্ছ অনন্ত-আকাশের কথা মনে থাকে?

আহা! আমার সে পাখী আর নাই! আজ চারিদিন হইল আমার সে পাখী মরিয়া গিয়াছে! মরিয়া কোথায় গিয়াছে? কে বলিবে কোথায় গিয়াছে? কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখি-তেছি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি যে সে মরিয়া অনন্ত হইয়াছে। আজ আমি যেখানে যে রঙ্ দেখি সেখানে সেই রঙে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে চোক্ দেখি সেখানে সেই চোকে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে ঠোঁট দেখি সেখানে সেই ঠোঁটে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। আজ আমি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল হিম তাপ পাহাড় পর্ব্বত ধূলা বালি বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ নর নারী সকলেতেই আমার সেই পাখী দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে আমার সেই পাখী অনুভব করিতেছি। আজ অনন্ত বিশ্বে আমার সেই পাখী ছাড়া আর কিছুই নাই।

আজ আমিও আমার সেই পাখী-ময়, এই অনন্ত বিশ্বও সেই পাখী-ময়। তাই আমিও আজ কি মধুময়,আমার অনন্ত বিশ্বও কি মধুময়! আমার ক্ষুদ্র পাখী আজ অনন্ত কায়া ধারণ করিয়া অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক ফোঁটা পাখী আজ অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছে। তাইতে অনন্ত বিশ্বও অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে সেই এক ফোঁটা পাখীতে মজিয়াছিলাম, তাইত আজ অনন্ত বিশ্ব দেখিলাম, অনন্ত বিশ্বে মজিলাম এবং অনন্ত বিশ্ব আমাতে মজিল। তাইত আজ অনন্ত হইলাম। তাইত আজ বুঝিলাম যে ফোঁটার ভিতরেই বিশ্ব ফোটে, ফোঁটা অনন্তেরও অনন্ত।

আমার পাখী আছে বৈ কি। কিন্তু আমার ছোট ছেলেগুলি আমাকে এক একবার জিজ্ঞাসা করে—পাখীটী কোথায় গেল?

৫ই চৈত্র, ১২৯২।

ছায়া।

ছায়া কিছুই নয়, অতি অসার, অতি অপদার্থ—'Tis but a shadow, ইহা ছায়া মাত্র, কিছুই নয়। সকলেই এই কথা বলে। সব দেশে সকল সময়ে সকল লোকেই এই কথা বলে। কথাটা কি ঠিক? বোধ হয় না।

ছায়া কিছুই নয়, তবে কি যাহার ছায়া তাহাই সব, তাহাই বিশেষ-কিছু? তাহা ত বুঝিতে পারি না। বৃক্ষের ছায়া যেন কিছুই

নয়; কিন্তু বৃক্ষই বা কি? ছায়াতে যেন কিছুই নাই, কিন্তু বৃক্ষেতেই বা কি আছে? বৃক্ষে কিছু থাক্ আর নাই থাক্, আমি মানুষ আমি সে-কিছুর কিছুই ত জানি না। তবে আমার সম্বন্ধে বৃক্ষ কিছুই নয় বলিলে দোষ কি? তুমি বলিবে যে বৃক্ষ কি তাহা না জানিলেও বৃক্ষ যে কিছুই নয় একথা বলা যায় না, কেন না উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয়, চোকে দেখা যায়, স্পর্শে কোন-একটা-কিছু বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু ছায়াও ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয়—চোকে দেখা যায়। তবে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ছায়ায় প্রভেদ কি? ফল কথা, ছায়া যদি কিছু না হয় তবে বৃক্ষও কিছু নয়। তবে কিছু-নয় বলিয়া ছায়াকে এত অবজ্ঞা কর কেন?

আসল কথা এই যে ছায়ার মতন জিনিস পৃথিবীতে বুঝি আর নাই, ছায়ার মতন রহস্য পৃথিবীতে অল্পই আছে। পৃথিবীর পৃথিবীত্ব পরিবর্ত্তনে। পরিবর্ত্তন লইয়াই পৃথিবী। রৌদ্রের পর মেঘ, মেঘের পর ঝড়, ঝড়ের পর বৃষ্টি, বৃষ্টির পর বন্যা—বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থার পর বার্দ্ধক্য—গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত--রাত্রির পর দিবস, দিবসের পর রাত্রি—ইহাই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব। এ পরিবর্ত্তন বন্ধ হউক পৃথিবীও অদৃশ্য হইবে। কিন্তু পৃথিবীতে যত কিছু আছে সকলের মধ্যে ছায়ায় যত পরিবর্ত্তন দেখি, আর কিছুতে তত দেখি না। সূর্য্যোদয় হইলে পর যেখানে ইচ্ছা সেইখানে বসিয়া দেখিও ছায়ার কত খেলা এবং কি চমৎকার খেলাই হইতেছে! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ছায়াটা দীর্ঘ ছিল,

সেটা ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে, যে ছায়াটা সোজা ছিল সেটা বাঁকা হইয়া গিয়াছে, যে ছায়াটা ঊর্দ্ধমুখী ছিল সেটা অধোমুখী হইয়াছে, যে ছায়াটা একলা ছিল সেটা পাঁচটার সঙ্গে মিশিয়া কোলাকুলি করিতেছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ছায়াটার শুধু দুইটা হস্ত ছিল সেটার দুইটা পাও হইয়াছে, যে ছায়াটার মাথা ছিল না সেটা একটা বৃহৎ মাথায় একটা বৃহৎ পাগড়ি বাঁধিয়াছে, যে ছায়াটা উলঙ্গ ছিল সেটা কতকগুলা কাপড় পরিয়াছে, যে ছায়াটা কাঙ্গালিনী ছিল সেটা নানা আভরণে ভূষিতা হইয়াছে, যে ছায়াটা বন্ধ্যা ছিল সে দিব্য একটা হৃষ্টপুষ্ট ছেলে পাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এত পরিবর্ত্তনের এত পরিপাটি, এত সুন্দর, এত কল্পনাময় খেলা আর কিছুতেই দেখিতে পাই না। এ খেলা দেখিতে দেখিতে সব ভুলিয়া যাই—বাড়ীঘর স্ত্রীপুত্র ধনজন আত্মপর সব ভুলিয়া যাই—ভুলিয়া এই খেলায় খেলিতে থাকি, খেলিতে খেলিতে ভ্রম হয় যে স্বয়ং কল্পনার সহিত খেলিতেছি। তখন কল্পনার রূপ দেখি, আকার দেখি, হৃদয় দেখি, প্রাণ দেখি, স্বরূপ দেখি—দেখিতে দেখিতে কল্পনায় কল্পনা হইয়া যাই। এত অল্প আয়াসে, এত অল্প সময়ে, এত অল্প সাধনায় আর কোন রকমেই এত কল্পনাময় হইতে পারি না—সেক্সপীয়র পড়িয়াও নয়, শেলী পড়িয়াও নয়, কিছু দেখিয়া, কিছু পড়িয়া নয়। ছায়াতে কল্পনার পূর্ণ এবং বড়ই প্রসন্ন মূর্ত্তি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইবে। ছায়া কিছুই নয় এমন কথা কি বলিতে আছে?

পৃথিবীতে যত জিনিস আছে সকলের অপেক্ষা ছায়া বেশী আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। যে মানুষ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে,

যাহার মনোবৃত্তি সকল সমুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার দৃষ্টি স্থূল নয়, সূক্ষ্ম, অর্থাৎ যে চর্ম্মচক্ষের সহিত মানসচক্ষু সংযোগ না করিয়া কোন জিনিস দেখে না, সে একটা ফুল দেখিবার সময় ফুলে যে রঙটা চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায় সে রঙটা দেখে না, সে রঙটাকে মনে মনে আর এক রকম করিয়া লইয়া দেখে—একটা পাতা দেখিবার সময় পাতার যে আকৃতি চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায় সে আকৃতি দেখে না, সে আকৃতিকে মনে মনে আর এক রকম করিয়া লইয়া দেখে, ইত্যাদি। অর্থাৎ সে একটা রঙ-বিশেষের বা আকৃতি-বিশেষের বিশেষত্বটুকু দেখে না, সকল রঙের এবং সকল আকৃতির যে সারমর্ম্মটুকু তাহার কল্পনায় প্রবেশ করিয়াছে সেই সার মর্ম্মের সংযোগে সেই রঙ-বিশেষ বা আকৃতি-বিশেষ দেখে। এই রকম করিয়া দেখিলে সে একটি বস্তুতে অনেক বস্তু দেখে, একটি রঙে বা আকৃতিতে অনেক রঙ বা আকৃতি দেখে। বস্তু-বিশেষের বিশেষত্ব তাহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, সে বস্তু-বিশেষের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে প্রবেশ করে, বলিতে গেলে তাহার চর্ম্ম-চক্ষের পাতা বন্ধ হইয়া আইসে—সে মানসচক্ষের দ্বারা বাহ্য-জগৎকে মানসজগতে পরিণত করিয়া ফেলে। এই রকম করিয়া দেখিলেই বাহ্যজগৎ দেখা হয়, শুধু চর্ম্মচক্ষে দেখিলে বাহ্যবস্তু-বিশেষ দেখা হয় মাত্র, বাহ্যজগৎ দেখা হয় না। বাহ্য-জগৎ বাহ্যবস্তুর সমষ্টি। সে সমষ্টি দেখিবার প্রকৃত চক্ষু চর্ম্মচক্ষু নয়, মানসিক চক্ষু; প্রকৃত শক্তি ইন্দ্রিয় নয়, আত্মা। ছায়াও চর্ম্মচক্ষে দেখিবার জিনিস নয়, মানস চক্ষে দেখিবার জিনিস। বৃক্ষের ছায়ায় বৃক্ষের আকার আছে মাত্র—বৃক্ষের ত্বকের ফাটা-

ফুটো, ঢিপিঢাপি, আটাশেয়ালা, উইপিপড়া কিছুই নাই, বৃক্ষের পাতার ভাল রঙ মন্দ রঙ কিছুই নাই, বৃক্ষের ফুলের কি গৌরব কি মলিনতা কিছুই নাই। অতএব বৃক্ষের ছায়ায় শুধু বৃক্ষের আকার আছে মাত্র—এবং সে আকার বড়ই বিশুদ্ধ, বড়ই সূক্ষ্ম, যেন একখানি ছায়া, একখানি স্বপ্ন, একটি কল্পনাময় কল্পনা, আত্মার ন্যায় শুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম। বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত—বৃক্ষের সূক্ষ্ম, সুন্দর, শুদ্ধ, স্বপ্নবৎ বৃক্ষত্ব মাত্র। সে ছায়া সূর্যালোকে দেখিও, যত পার দেখিও, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ লাভ করিবে। কিন্তু স্থির বায়ুতে একবার জ্যোৎস্নালোকেও দেখিও। জ্যোৎস্নালোকে সে ছায়া দেখিলে পাগল হইয়া যাইবে—সে ছায়া জ্যোৎস্নালোকে এতই কল্পনারূপী, এতই ভাবরূপী, এতই আত্মারূপী। সে আলোকে সে ছায়াকে কোন-কিছুর ছায়া বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় বুঝি সে ছায়া ইচ্ছাময়ের সাধের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সে ছায়া দেখিলে বাহ্জগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়। সে ছায়া না দেখিলে আধ্যাত্মিক জগৎ কাহাকে বলে বুঝিতে পারা যায় না। জড় হইতে আত্মার প্রভেদ যদি বুঝিতে চাও তবে সেই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের সেই ছায়ায় প্রবেশ করিও। ছায়া কিছুই নয় এমন কথা কি বলিতে আছে ?

যে ছায়ার কথা বলিতেছি সে ছায়া যে একেবারেই চোকে দেখিবার জিনিস নয় এমন কথা বলি না। প্রতিভা সম্পন্ন চিত্রকরের চিত্র যদি চোকে দেখিবার জিনিস হয় তবে সে ছায়াও চোকে দেখিবার জিনিস। অথচ চোকে দেখিবার জিনিস চোকে দেখিলে লোভ লালসা প্রভৃতি যে রকম চিত্ত-

বিকার জন্মিয়া থাকে, সে ছায়া দেখিলে সেরকম কিছু হয় না। বরং চিত্ত বিকৃতাবস্থায় থাকিলে সে ছায়া দেখিয়া চিত্ত সুস্থ সুনির্ম্মল এবং পবিত্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে বস্তু দেখিলে চিত্ত বিচলিত না হইয়া সুস্থির ও সংযত হয় সেই বস্তুই চোকে দেখা উচিত। যে ছায়ার কথা বলিতেছি সে ছায়া সেই রকমের বস্তু। কিন্তু সে ছায়া বুঝি কেহ এখনও ভাল করিয়া দেখে নাই এবং বোধ হয় কোন দেশে প্রতিভাশালী চিত্রকর এখনও সে ছায়া মানবজাতির শিক্ষা, সুখ এবং আনন্দ বর্দ্ধনার্থ অতুল কৌশলে চিত্রিত করেন নাই। এ দেশে ভাল চিত্র বা চিত্রশালা নাই—ইউরোপে আছে। কিন্তু যে ছায়ার কথা বলিতেছি ইউরোপের চিত্রশালায় সে ছায়ার চিত্র আছে কি না জানি না। বোধ হয় নাই। মহামতি রস্কিণের গ্রন্থেও সে ছায়ার চিত্রের কথা পড়ি নাই। সে ছায়ার চিত্র কি হইবে না? যদি হয় বোধ হয় ভারতেই হইবে। যে দেশের লোক নির্ম্মল, নির্লিপ্ত আত্মার কথা বুঝে কেবল সেই দেশেই সে চিত্র চিত্রিত হওয়া সম্ভব।

লোকে বলে ছায়া কিছুই নয়। এক হিসাবে ছায়া কিছু নয়ই বটে, কেন না ছায়ার আকার আছে মাত্র, শরীর নাই, সৌরভ নাই, কিছু নাই। কিন্তু কিছু না হইয়াও ছায়া একটী স্বতন্ত্র জগৎ। মধ্যাহ্ন কালে যখন আকাশে প্রখর রবি, পৃথিবী সূর্য্যের শুভ্র আলোকে আলোকময়, তখন পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিও, নিশ্চয় মনে হইবে যে যে স্থান ব্যাপিয়া সেই ছায়া সেই স্থান একটি স্বতন্ত্র স্থান, সেই ছায়া-রেখার পরেই একটি স্বতন্ত্র স্থান, একটি স্বতন্ত্র জগৎ। মধ্যাহ্ন কালে পথের ধারে সেই রকম বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া দেখি-

য়াছি। সম্মুখে দুই হাত তফাতে সূর্য্যালোকোদ্দীপ্ত পথ দিয়া কত লোক গিয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু মনে হইয়াছে আমি একটা জগতে বসিয়া আছি আর সেই সকল নর নারী আর একটা জগতে চলাফেরা করিতেছে। মনে হইয়াছে যে আমার সম্মুখের সেই ছায়া-রেখাটি দুইটি ভিন্ন জগতের মধ্যস্থিত একটা অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাকার বা প্রাচীর। মনে হইয়াছে সে ছায়ায় বসিয়া আমি ভাল কথা, মন্দ কথা, সুখের কথা, দুঃখের কথা সব কথা কহিতে পারি, কেহ আমার কথা শুনিবে না, শুনিতে পাইবে না, শুনিতে আসিবে না। এবং সেই ছায়ায় বসিয়া মনের কথা কহিতে কহিতে ইহাও দেখিয়াছি যে সম্মুখ দিয়া যে সকল নর নারী চলিয়া যাইতেছে তাহারা যেন আমাদিগকে তাহাদের জগতের কি তাহাদের মতন কেহ নয় মনে করিয়া আমাদিগকে দেখিয়াও না দেখিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই বুঝি মনের কথা কহিতে হইলে লোকে রাস্তা হইতে সরিয়া গিয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া কথা কয়। তাই বুঝি গোল্ডস্মিথ্ গাছতলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"For talking age and youthful converse made."

ছায়া একটা স্বতন্ত্র জগৎই বটে। মানুষ খোলা জগতে বাস করিলে সূর্য্যের তাপে পুড়িয়া মরে। তাই মানুষ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহার ছায়ায় জীবন রক্ষা করে। জড়পদার্থের ছায়া না থাকিলে মানুষ জড় জগতে থাকিতে পারিত না, থাকিলেও অশেষ এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিত। জড়পদার্থকে ছায়া-বিশিষ্ট করিয়া জগদীশ্বর একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা তিনিই

জানেন। কিন্তু আমরা সেই ছায়াময় জগতে জগদীশ্বরের সুন্দর, সুশীতল, সঞ্জীবনী ছায়া দেখিতে পাই। আমরা দয়ার কাঙ্গাল, আমাদের মনে হয় সেই ছায়াময় জগৎই দীননাথের দয়ার প্রকৃত স্বরূপ। ছায়া কিছুই নয়, কাঙ্গাল মানুষের মুখে কি একথা সাজে? মানুষের স্বভাব ভাল নয়। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান বড়ই কম!

মানুষের দেহই কি শুধু ছায়া-জগতে বাঁচিয়া থাকে ও পুষ্টিলাভ করে? মানুষের মনও ছায়া-জগতে থাকিয়া উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়। প্রথম মনুষ্যের অবস্থা মনে কর দেখি—কিছু জানে না, কিছু বুঝে না, ভয়ে আকুল, পদে পদে ভ্রমবশতঃ ভীষণ অবস্থাপন্ন, রোগে নিরুপায়, পূজায় পিশাচ-শাসিত। অনেক ভুগিয়া, অনেক সহিয়া প্রথম মনুষ্য মরিয়া গেল। পৃথিবীতে কিছু রাখিয়া গেল না—কেবল এক খণ্ড পশুচর্ম্ম আর দুই খণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া গেল। দ্বিতীয় মনুষ্য সেই চর্ম্মটুকু এবং কাঠ দুইখানি পাইয়া যেন কতই শান্তি লাভ করিল, কত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। আতপতাপিত পথিক বৃক্ষের ছায়া পাইলে যেমন চরিতার্থ হয়, প্রথম মনুষ্যের চর্ম্মখণ্ডটুকু এবং কাঠ দুইখানি পাইয়া দ্বিতীয় মনুষ্যও তেমনি চরিতার্থ হইল। সেই চর্ম্মখণ্ডটুকু এবং দুই খানি কাষ্ঠে দ্বিতীয় মনুষ্য প্রথম মনুষ্যের ছায়া দেখিতে পাইল। সেই ছায়ায় বসিয়া পশু-বধার্থ সে একটি পাথরের তীর নির্ম্মাণ করিল। নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কাষ্ঠ এবং চর্ম্ম-খণ্ড এবং তাহার আপনার পাথরের তীরটি রাখিয়া মরিয়া গেল। তৃতীয় মনুষ্য সেই সবগুলি পাইয়া আরো একটু বেশী

সুখশান্তি লাভ করিল, ক্লেশ হইতে আরো একটু মুক্ত হইল, তাহার জীবন-পথের যন্ত্রণা আরো একটু কমিল, তাহার জীবন-পথের উপর তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ছায়া আরো একটু প্রশস্ত, আরো একটু ঘনীভূত হইল। এইরূপে মনুষ্য-পর্য্যায় যত বাড়িতে লাগিল, মানুষের পূর্ব্ব পুরুষের ছায়াও তত বাড়িতে লাগিল, সেই ছায়ায় বসিয়া মানুষের সুখ, শান্তি,সদ্বুদ্ধি,সদাশয়, সুনীতি, সুরীত, সাত্বিকতা, সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য তত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ছায়া বাড়িয়া বাড়িয়া গাঢ়তর হইয়া বিরাট-রূপ ধারণ করিল। সেই বিরাট ছায়ায় বসিয়া বিরাট মনুষ্য-সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুরাণে, দর্শনে, কাব্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে বিরাট-কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়া বিরাট-সভ্যতা সৃষ্টি করিল। মানুষের মন পূর্ব্ব পুরুষের বিরাট ছায়া পায় বলিয়াই বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। নহিলে মানুষের পর মানুষ, পুরুষের পর পুরুষ, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায় পশু পক্ষীর ন্যায় সমান কাঙ্গাল সমান শোকার্ত্ত থাকিয়া যায়, জীবন-পথে সমান তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যায়। মানুষের দেহ এবং মন উভয়ই ছায়ায় থাকিয়া রক্ষিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। বাহ্যজগতে এবং অন্ত-র্জগতে দুইখানা প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙান আছে। সেই দুই খানা সামিয়ানার ভিতর প্রকাণ্ড ছায়া-জগৎ ঝোলান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একখানা ছায়া-জগতে মানুষের দেহ আর একখানা ছায়া-জগতে মানুষের মন সুখে বাস করিয়া সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। দেহ এবং মন উভয়েই পথের পথিক—ছায়া না পাইলে কি পথে চলিতে পারে? তবুও মানুষ বলে কি না যে ছায়া কিছুই নয়! ছায়ায় থাকিয়া ছায়া চেনে না, ছায়া মানে

না বলিয়া মানুষ এত চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত মহত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে মানুষ ছায়া মানে না সেখানে মানুষের সকল চেষ্টা বিফল হয়। আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ছায়ার মাহাত্ম্য মানে না। তাই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোলপাড় করিয়াও সে আজ মানুষ নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্রস্থল বিলাত দর্শন করিয়াও বিকলমতি! মানুষের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়াও মানুষ যদি মানুষের ছায়া না মানে তাহা হইলে মানুষ মানুষকে ছায়া দান করিতেও পারে না। তাই আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় কোন দেশীয় আতপতাপিত পথিককে ছায়া দান করিয়া জীবন-পথের যন্ত্রণার কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম করিতে পারিতেছে না। তাই আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বলি, ছায়া মানিয়া ছায়া দান করিও, মানুষও হইবে, জীবনও সার্থক হইবে। নিজে ভক্ত এবং কৃতজ্ঞ না হইলে অপরকে কি ভক্ত ও কৃতজ্ঞ করা যায়?

ছায়া আত্মত্যাগের ফল। গাছের ছায়ায় গাছের রঙ থাকে না, গাছের দেহের পুষ্টি ও স্থূলতা থাকে না, গাছের জ্যোতি ও লাবণ্য থাকে না, গাছের তেজ থাকে না, গাছের রস থাকে না, গাছের ফুলের সৌরভ থাকে না, গাছের ফলের শাঁস বা সুস্বাদ থাকে না। গাছ সব ত্যাগ করিলে তবে গাছের ছায়া হয়। সব ত্যাগ করিয়া গাছ ছায়ারূপী হইলে তবে আতপতাপিত পথিকের আশ্রয়স্থল হয়। স্ত্রী পুত্র জনক জননী ভাই ভগিনী দাস দাসী বন্ধু বান্ধব সুখ সম্পদ ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ছায়ারূপী হইলে পর তবে বুদ্ধ চৈতন্য অসংখ্য আতপতাপিত অনন্তপথের-পথিকের বিশ্রামস্থান

হইয়াছিলেন। তুমি আমি ক্ষুদ্রলোক, বুদ্ধ চৈতন্য হইতে পারিব না। কিন্তু আমরা যেমন তেমনি ছায়ারূপী হইয়া তেমনি স্বল্প প্রাণীর আশ্রয়স্থান হইতে পারি ত। কিন্তু সেইরূপ ছায়ারূপী হইতে হইলেও আমাদিগকে আমাদের অনেক জিনিস পরিত্যাগ করিতে হইবে। বহু দিন হইল আমার একটি হিন্দু বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ মাত্র তাহার উপর আমার স্নেহ জন্মে। বালিকা তিন চারি বৎসরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দেহ যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্ণ জোয়ারে সুন্দর স্রোতস্বিনী যেন কূলে কূলে পূরিয়া উঠিল, গাঙ্গ্-ভরা জল যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। যুবতী শ্যামাঙ্গী —কিন্তু শ্যামাঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না—শ্যামাঙ্গীর সৌন্দর্য্যের ছটা যেন চাঁদের হাসির ন্যায় হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন যুবতীর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত দেহে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হইয়াছে। অত ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন বলিয়াই যুবতী যেন লজ্জায় অত কুণ্ঠিত। এই সময় কিছু দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আবার যখন দেখিলাম, তখন আর তাঁহাকে দেখিলাম না, দেখিলাম তাঁহার একখানি ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ ছায়া বসিয়া রহিয়াছে! তাঁহার দেহের তত ঐশ্বর্য্য তাঁহার দেহে নাই—সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছায়ারূপী দেহের ছায়ারূপী অঙ্ক-স্থিত শত-দল-পদ্ম-সদৃশ একটি শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে! ঐশ্বর্য্যরূপিণী যুবতী আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সন্তানকে দিয়া আপনি ছায়ারূপিনী জননী হইয়াছেন! তখন মনে হইল এমন করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য পরকে দিতে বুঝি বুদ্ধ, চৈতন্যও পারেন না, পরের জন্য বুদ্ধ চৈতন্যও বুঝি এত ছায়ারূপী হইতে পারেন

না। যুবতীকে জননী হইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে জগতে ছায়া হইতে না পারিলে জগতে মানুষের জীবন বৃথা। আর বুঝিলাম যে যুবতী অপেক্ষা জননী সুন্দর এবং বৃক্ষ অপেক্ষা বৃক্ষের ছায়া সুন্দর, কেন না জননী অন্যের জন্য যুবতীর সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপিনী হন এবং বৃক্ষের ছায়া অন্যের জন্য বৃক্ষের সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ করে। জগতে যদি সার্থক ও সুন্দর হইতে চাও তবে বৃক্ষ ও জননীর ন্যায় আপনার সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ কর। ছায়াই পৃথিবীর সার পদার্থ। ছায়ার অর্থ বুঝিয়া ছায়া হইয়া পৃথিবীর সার পদার্থ হও।

বউ কথা কও।

"বৌ কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙ্ছে বয়ের মান।" দীনবন্ধু প্রভাত বর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। কথাটী কিন্তু ঠিক নয়,—বউ-কথা-কও সকল সময়েই, সকাল সন্ধ্যা সকল সময়েই, বউ কথা কও বলে—তথাপি দীনবন্ধুর কথাটী ঠিক নয়।

বঙ্গের——জেলায় কৌশিকী নদী প্রবাহিতা। নদীটি ক্ষুদ্র। দেখিতে যেন এক ছড়া রূপার হার। নদীর দুই কূলে শস্যক্ষেত্র, আম্রকানন, ও প্রাচীন জনপূর্ণ পল্লিগ্রাম। পল্লিবাসিনীরা নদীর জলে বাসন মাজে, স্নান করে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগ্রিবনিমজ্জিতা হইয়া সুখ ও সংসারের কথা কয়। নদীতে প্রচুর মৎস্য—পল্লিবাসীরা মনের সাধে মাছ খায়।

কৃষকেরা নদীর জলে আপন আপন ক্ষেত্রে সোণা ফলায়। কৌশিকীধৌত জনপদে "অকাল অজন্মা" হয় না।

কৌশিকীতীরে—গ্রাম। গ্রামখানি প্রাচীন এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান। গ্রামের একস্থানে কৌশিকীর ধারে একটী বৃহৎ আম্রকানন। সেই আম্রকাননে ঘোষ মহাশয়দিগের বাড়ী। বৃহৎ গোষ্ঠীর বৃহৎ বাড়ী। বাড়ী সাত কি আট অংশে বিভক্ত। এক অংশের কর্ত্তা লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ সহোদর। লক্ষ্মীকান্ত বর্ষীয়ান পুরুষ। তাঁহার পাঁচটী সহোদরেরই বিবাহ হইয়াছে। এবং তাঁহাদের সকলেরই সন্তানাদি হইয়াছে। ছেলে মেয়ে পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতিতে লক্ষ্মীকান্তের গৃহ একটী জনপদতুল্য।

লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। তাঁহার একখানি তালুক আছে। তাহার আয় নিতান্ত কম নয়। সেই আয়ে তাঁহার বাড়ীতে সদাব্রত দোল দুর্গোৎসব বার মাসে তের পার্ব্বণ সকলই অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষুক নিরাশ হয় না, দায়গ্রস্থ ব্যক্তি ভগ্নমনোরথ হয় না, জ্ঞাতি উপেক্ষিত হয় না, কুটুম্ব পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হয়। তাঁহার গোলাবাড়ীতে বড় বড় শস্যপূর্ণ গোলা। তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে বহুসংখ্যক গাভী ও হলবাহী বৃষ। তাঁহার বাগানে আম্র কাঁটাল নারিকেল তিন্তিড়ি প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। তাঁহার বড় বড় পুষ্করিণী—তাহার জল অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—পুষ্করিণীতে অজস্র মৎস্য। তিনি পুণ্যবান—তাঁহার সংসার সুখের সংসার, তাঁহার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

লক্ষ্মীকান্তের পত্নী বিদ্যাবতী লক্ষ্মীকান্তের গৃহের গৃহিণী।

বিদ্যাবতী রূপে গুণে লক্ষ্মী। বিদ্যাবতীর অনেকগুলি দৌহিত্র দৌহিত্রী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী পাঁচবৎসরের পুত্র-সন্তান। বিদ্যাবতী এই বৃহৎ পরিবারের—এই বৃহৎ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পতি পুত্র পুত্রবধূ কন্যা দেবর দেবরপত্নী ননদন কুটুম্বিনী পরিচারক পরিচারিকা সরকার গোমস্তা গুরুমহাশয় পাইক চৌকিদার রাখাল কৃষাণ গাভী গোবৎস তিনি সমান যত্নে সকলেরই সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন—সকলেই তাঁহার স্নেহে মুগ্ধ।

আর স্বয়ং বিদ্যাবতী তাঁহার পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ। তাঁহার বৃহৎ সংসারের বৃহৎ যজ্ঞবৎ নিত্য শুশ্রূষায় তাঁহার পুত্রবধূই তাঁহার প্রধান সহায়—তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। পুত্রবধূর নাম সরস্বতী। সরস্বতী যেমন ঘরের মেয়ে, যেমন ঘরের বউ, তাঁহার গুণও তেমনি। বউ লইয়া শ্বাশুড়ি পাগল। বউ কাছে থাকিলে শ্বাশুড়ির চক্ষে পলক পড়ে না। শ্বাশুড়ি মনে করেন, বউ আছে তাই আমার সব আছে, বউ গেলে আমার কিছুই থাকিবে না, আমার সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

এ কথা আমরা সকলেই জানি।—আজ আর এক কথা শুনাইব।

বিদ্যাবতী প্রাতঃস্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন বউ তথায় নাই—রন্ধনের কোন আয়োজনই হয় নাই। পূর্ব্ব রাত্রিতে বউয়ের কিঞ্চিৎ পীড়া হইয়াছিল তিনি তাহা জানিতেন না। হঠাৎ তাঁহার রাগ হইল। তিনি রাগভরে বধূর নিকট গিয়া বলিলেন—বাছা, এ ত তোমার পিত্রালয়

নয় যে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিবে। বিদ্যাবতীর যেমন রাগ হইয়াছিল তাঁহার তিরস্কার তেমন কটু হইল না বটে ; কিন্তু তিরস্কার কিছু মিঠে রকম হইল বলিয়াই বধূর প্রাণে কিছু বেশী বিঁধিল।

শ্বাশুড়ি রন্ধন করিতে লাগিলেন—বেলা হইতে লাগিল। তথাপি বধূ রন্ধনশালায় আসিলেন না। আরো বেলা হইল— তখন শ্বাশুড়ি বধূকে ডাকিতে লাগিলেন—তথাপি বধূ রন্ধনশালায় আসিলেন না। তখন শ্বাশুড়ি একবার বধর ঘরে গিয়া দেখিলেন, বধূ গৃহের একটী কোণে বসিয়া আছেন, তাঁহার অবগুণ্ঠনবস্ত্র চক্ষের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বিদ্যাবতীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল—তিনি বধূর হাত ধরিয়া তাঁহাকে কতই বুঝাইলেন। কিন্তু বধূ উঠিলেন না। তখন বিদ্যাবতীর দুঃখের উপর ভয় হইল। তিনি কর্ত্তাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকে কাতর স্বরে সকল কথা বলিলেন। লক্ষ্মীকান্ত পত্নীকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সহোদরদিগকে, তৎপরে কন্যাগণকে, তারপর দৌহিত্র দৌহিত্রীদিগকে, তারপর ভ্রাতৃবধূদিগকে, তারপর পরিচারিকাদিগকে—এইরূপে বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলকে জড় করিয়া বলিলেন—"আজ বড় বিপদ, আজ বউমা রাগ করিয়াছেন, তোমরা সকলে যেমন করিয়া পার বউমাকে সান্ত্বনা কর, বউমা না উঠিলে আমি আজ জলগ্রহণ করিব না।" তখন সকলেই কর্ত্তা মহাশয়ের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। মেয়ে পুরুষ বালক বালিকা পরিচারিকা প্রভৃতি সকলেই বধূকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তথাপি বধূ উঠিলেন না।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর—সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে—তখনও লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীর শিশুদিগের পর্য্যন্ত আহার হয় নাই। এক বধূর জন্য লক্ষ্মীকান্তের সেই সোণার সংসারে কাহারো মনে তখন সুখ নাই—সকলেই সশঙ্কিত ও সন্তপ্ত—সকলেই ভাবিতেছে, বেলা দ্বিপ্রহর হইল, বধূ এখনো মুখে হাতে জল দিলেন না, না জানি কি অমঙ্গলই ঘটিবে! দ্বিপ্রহর অতীত হইল। দুই একটী শিশু খাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকান্ত আর থাকিতে পারিলেন না। তুমি কি অনর্থই ঘটাইলে, পত্নীকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং বধূর কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। বিদ্যা-বতী জড়সড় হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেই গভীর আম্রকানন মধ্যে পাখী ডাকিল—

বউ কথা কও

লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ বৎসরের পৌত্র বলিয়া উঠিল—মা, ঐ তোকে কে কথা কইতে বল্‌চে! বিদ্যাবতী বলিলেন—মা, কোথাকার বনের পাখী আসিয়া তোকে সাধিতেছে, তবুও উঠিবি না মা। লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন—উঠ মা, তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী, তুমি অনাহারে থাকিলে আমার সংসারের অমঙ্গল হইবে। সরস্বতী শিশুকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন।

বউ-কথা-কও, ডাকে সকল সময়েই—প্রভাতেও ডাকে—কিন্তু বউয়ের মান ভাঙ্গে কেবল দ্বিপ্রহরে। প্রভাতে পত্নীর মান হয়, বউয়ের মান হয় না। বউ-কথা-কও শয়নগৃহের পাখী নয়—সংসারাশ্রমীর সংসারক্ষেত্রের পাখী। হিন্দুর বধূর অসীম

গৌরব আর বউ-কথা-কও পক্ষী সেই অসীম গৌরবের অনন্ত-প্রেরিত অনন্ত-বিহারী গায়ক।

হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব। কেন না হিন্দুর বধূ ভূত ও ভবিষ্যতের গ্রন্থিস্থল। বধূ বিনা হিন্দুর উত্তর পুরুষের অভাব হয় এবং উত্তর পুরুষের অভাব হইলেই পূর্ব্ব পুরুষেরও অভাব হয়। বধূ বিনা বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে না—সমস্তকুলস্মৃতি ব্যর্থ ও লুপ্ত হইয়া যায়—বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধনশীল শক্তি ছারখার হইয়া ঐকান্তিক অকর্ম্মণ্যতায় পরিণত হয়। তদপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণা, হীনতা আর নাই। সৃষ্টিক্রিয়া অর্থাৎ যে সৃষ্টিতে সৃষ্টি রক্ষা হয় সেই সৃষ্টিক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য। ভগবানের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য সৃষ্টি। বিনা পুণ্যে সৃষ্টি হয় না—যেখানে পাপ সেখানে সৃষ্টি অসম্ভব। আর বিনা পুণ্যে সৃষ্টি রক্ষাও হয় না—পরিবার বল, সমাজ বল, জাতি বল, পাপ স্পর্শে সকলই লয় হইয়া যায়। অতএব পারিবারিক স্থিতি ও বংশাবলীর ধারাবাহিকতা পুণ্যরূপ মহাশক্তির ফল। এবং সে জন্য পারিবারিক স্থিতি ও পুরুষের ধারাবাহিকতা হিন্দুদিগের মধ্যে এত প্রার্থনীয় ও এত গৌরবের জিনিস। হিন্দুর বধূ সেই পারিবারিক স্থিতি ও ধারাবাহিকতার হেতু বলিয়া তাঁহার গৌরব অসীম। এবং সেই জন্যই সেই অনন্ত-প্রেরিত অনন্ত-বিহারী বউ-কথা-কও পাখী গৌরবরূপিনী হিন্দুর বধূর উপাসনায় ও গৌরব কীর্ত্তনে নিযুক্ত।

দুইটি হিন্দু পত্নী।

পত্নী একমনে পতিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন—পতির সহস্র অপরাধ সত্ত্বে পত্নী তাঁহাতে অনুরক্তা থাকিবেন এবং তাঁহার তুষ্টিসাধন করিবেন—পতিতে পত্নী সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন—প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ সংহিতা কাব্যাদিতে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ নয়, আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থ। এই দুইখানি আধুনিক গ্রন্থে দুইটি পত্নী দেখিতে পাওয়া যায়—বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ পত্নীর সদৃশ কি না একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস দুইখানির প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিপ্রেমে মুগ্ধ। সূর্য্যমুখী বলেন—"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে,তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী।"

ভ্রমর বলেন—"আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি।"

আরো দেখা যায় যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর পতিতে কেবল মুগ্ধ নন, দেবতা বা গুরুপদারূঢ় ভাবিয়া পতির প্রতি ভক্তের ন্যায় ভক্তিমতী।

সূর্য্যমুখী স্বামীকে বলিতেছেন—"তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড় না আমি বড়?"

ভ্রমর স্বামীকে বলিতেছেন—"আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা।"

পতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েরই সমান। প্রেমের কথা এখন ছাড়িয়া দি। প্রকৃত প্রেমের পাত্রের প্রতি যে ভক্তি সর্ব্বত্র অবশ্যম্ভাবী এ ভক্তি কেবল সে ভক্তি নয়। এ ভক্তি একমাত্র হিন্দু পত্নীর ভক্তি। এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই সমভাবে হিন্দু পত্নীর লক্ষণাক্রান্তা।

পত্নীদ্বয় যেমন পতিদ্বয়ে মুগ্ধ, পতিদ্বয়ও তেমনি পত্নীদ্বয়ে মুগ্ধ। কিছুদিন এইরূপে গেল। তাহার পর উভয় পত্নীর ভাগ্যে একই রকম বিড়ম্বনা ঘটিল। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত হইলেন। দুই জনের আসক্তিই প্রবল—উন্মত্ততার তুল্য। এই বিড়ম্বনায় পড়িলে পর দুইটি পত্নীতে বিষম পার্থক্য প্রকাশ পাইল। দুইজনেই মর্ম্মাহত হইলেন সত্য; কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়া একজন পতিকে সুখী করিবার সঙ্কল্প করিলেন আর একজন পতির উপর দুর্জ্জয় রাগ ও অভিমান করিলেন। দুইটি পত্নীর দুই প্রকার আচরণের ফল বড় বিভিন্ন হইল।

সূর্য্যমুখী যখন দেখিলেন যে কুন্দনন্দিনীকে না পাইলে নগেন্দ্রনাথের জীবন ক্লেশময় হইবে, হয়ত নগেন্দ্রনাথ দেশত্যাগী হইবেন, তখন নগেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার কিছুমাত্র রাগ বা

অভিমান হইল না, তখন তিনি নগেন্দ্রনাথকে সুখী করিবার জন্য নিজেই উদ্যোগী হইয়া কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। রাগ অভিমানাদি না করিয়া এমন করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে এক হিন্দু পত্নী ভিন্ন আর কেহ পারে না। কিন্তু স্বামীকে সুখী করিয়া সূর্য্যমুখী নিজে সুখী হইতে পারিলেন না। ভাবিয়াছিলেন সুখী হইবেন—হিন্দু পত্নী মাত্রই ভাবিয়া থাকেন স্বামীর সুখেই আপনার সুখ। কিন্তু সূর্য্যমুখী সুখী হইলেন না। তাই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। স্বামী সপত্নী লইয়া গৃহে সুখভোগ করিতে লাগিলেন বলিয়া যন্ত্রণা নয়। স্বামীদর্শনে বঞ্চিত বলিয়া যন্ত্রণা। তখন সূর্য্যমুখী বুঝিলেন—তাঁহার নিজের কিছুই নাই, তাঁহার সমস্তই তাঁহার স্বামীর। তখন তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—"স্বামীর আর কেহ থাকে থাক্, আমার ত স্বামী বই আর কেহ নাই, আমাতে ত স্বামী বই আর কিছুই নাই।" আর বলিলেন—"আমাতে যখন স্বামী বই আর কিছুই নাই তখন আমার স্বামীর কুন্দের জন্য আমার জ্বালাই বা কি যন্ত্রণাই বা কি; আমার স্বামীও যেমন আমার, আমার স্বামীর কুন্দও তেমনি আমার।" তখন রাধা যেমন জ্বালা যন্ত্রণা মান অভিমান সব ভুলিয়া কৃষ্ণলাভার্থ প্রভাসে ছুটিয়াছিলেন, সূর্য্যমুখীও তেমনি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া নগেন্দ্রলাভার্থ গোবিন্দপুরে ছুটিলেন।—যে কুন্দের জন্য স্বামী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, স্বামীর সেই কুন্দকে লইয়া স্বামীতে মিশিয়া থাকিবেন বলিয়া স্বামীলাভার্থ গোবিন্দপুরে ছুটিলেন। সূর্য্যমুখীতে যে একটু 'আমিত্ব' ছিল, তাঁহার প্রেমে

যে একটু স্বার্থের ভাঁজ ছিল, তাহা আর রহিল না। তাঁহার প্রেম এখন সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়া প্রেমের যে চরম, যে আদর্শমূর্ত্তি তাহাই ধারণ করিল। প্রেমের সে মূর্ত্তি অন্য দেশে কেবলমাত্র কবির কল্পনায় বা আকাঙ্ক্ষায় থাকে, এদেশে অনেক পতিপরায়ণা পত্নীতে থাকে। অন্যদেশে পত্নী পতির অনুরোধে নিজের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। কিন্তু এমন করিয়া সপত্নীর জ্বালা ভুলিয়া সপত্নীকে সঙ্গে লইয়া পতিতে মিশিয়া থাকিতে এক হিন্দু পত্নী বই আর কেহ পারে না *। অন্য দেশে যে প্রেম কল্পনার সামগ্রী মাত্র, এদেশে তাহা নারীজীবনে দ্রষ্টব্য। হিন্দুপত্নীকে না বুঝিলে প্রেমরহস্য পূর্ণমাত্রায় বুঝা যায় না। ইউরোপ কখন প্রেম-রহস্য পূর্ণমাত্রায় বুঝে নাই। তাই বিষবৃক্ষের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপবাসী সূর্য্যমুখীকে বুঝিল না। আমরা ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী দেখিয়া থাকি। তাই আমরা বুঝিয়া থাকি যে সূর্য্যমুখী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শানুযায়ী পূর্ণমাত্রায় হিন্দুপত্নী অর্থাৎ প্রেমের চরম মূর্ত্তি।

ভ্রমর যখন জানিতে পারিলেন যে গোবিন্দলাল রোহিণীতে অনুরক্ত, তখন তিনি রাগে এবং অভিমানে যেন আত্মহারা হইলেন। তিনি স্বামীকে লিখিলেন।—

"তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তাহা নহে। যতদিন

* হয়ত কোন পাঠক এইখানে মনে করিবেন যে আমি পুরুষের বহুবিবাহের বা সপত্নী প্রথার পক্ষপাতী।

তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই—বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।"

কুন্দনন্দিনীর উপর পতির অনুরাগ দেখিয়া সূর্য্যমুখী ভাবিয়াছিলেন যে, কুন্দকে না পাইলে পতি যদি অসুখী হন,তবে আমি নিজেই পতিকে কুন্দনন্দিনী দিব। ইহা প্রেমের আত্ম-বিসর্জ্জন। প্রেমের এরূপ আত্ম-বিসর্জ্জন অন্যদেশে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহা হিন্দু পত্নীর একটি সচরাচর-দৃষ্ট লক্ষণ। এ লক্ষণ কিন্তু ভ্রমরে নাই। ভ্রমর যখন জানিলেন যে তাঁহার পতি রোহিণীর আকাঙ্ক্ষী তখন তিনি এমন ভাবিলেন না যে রোহিণীকে গ্রহণ করিতে না পাইলে পতি যদি অসুখী হন, তবে তিনি রোহিণীকেই গ্রহণ করুন। তখন পতির উপর তাঁহার কি বিষম রাগ হইল তাহা তাঁহার উদ্ধৃত কথাগুলিতেই প্রকাশ।

আবার যখন ভ্রমরের নিতান্ত কাতর মিনতিতে কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দলাল তাঁহার নিকট একরকম চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন ভ্রমর গোবিন্দলালকে কি বলিলেন শুন—

"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।

আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

"এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।"

সাত বৎসর পরে ভ্রমর যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়, গোবিন্দলাল তখন পেটের জ্বালায় ভ্রমরের নিকট আসিতে চাহিলেন। "তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্রধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িলেন। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িলেন।' তাহার পর "প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে গোবিন্দলালের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিলেন। প্রত্যু-ত্তরের শেষ কথা এই :—

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।"

এখনও সেই বিষম রাগ! এখন গোবিন্দলালের সে রোহিণী নাই—এখন গোবিন্দলাল লজ্জায় ঘৃণায় মৃতবৎ, অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট। তথাপি গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের এখনও সেই বিষম রাগ! সূর্য্যমুখী হইলে, এরূপ পত্র লেখা দূরে থাকুক, স্বয়ং স্বামীর

নিকট ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পায় ধরিয়া স্বামীকে গৃহে আনয়ন করিতেন।

তবে কি ভ্রমর হিন্দু পত্নী নন ?

স্বামীর উপর ভ্রমরের বিষম রাগ সত্য। কিন্তু এত রাগেও স্বামীর প্রতি ভ্রমরের হৃদয়ভরা ভক্তি—প্রাণভরা প্রেম—স্বামীই ভ্রমরের ধ্যান জ্ঞান উপাসনা আরাধনা। বিষম রাগভরে স্বামীকে তিরস্কার করিতে করিতেও ভ্রমর বলিলেন—"যদি কায়মনো-বাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।" বিষম রাগভরে স্বামীকে বিদায় দিয়া চলিয়া যাইবার সময়ও ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আবার প্রায় সেই শেষের দিনে, যথন স্বামীর উপর ভ্রমরের তেমনি বিষম রাগ, তথন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, স্বামীর সেই পত্র পড়িলেন। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িলেন। এবং স্বামীর পত্রের প্রত্যুত্তরে যে পত্র লিখিলেন—যাহাতে স্বামীকে বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আমি সন্তুষ্ট"—তাহা "প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ," এই সম্মান ও ভক্তিসূচক পাঠে লিখিলেন।

এত রাগের সঙ্গে সঙ্গে এত প্রেম, এত ভক্তি—এ রহস্য ভেদ করে কাহার সাধ্য? বিজ্ঞানের অনেক রহস্য আছে, দর্শনের অনেক রহস্য আছে, কাব্যের অনেক রহস্য আছে, জড়জগতের অনেক রহস্য আছে, অন্তর্জগতের অনেক রহস্য আছে, কিন্তু ভ্রমরের হৃদয়ের এই রহস্যের মতন রহস্য বুঝি আর নাই। দেবতারা এ রহস্য বুঝিতে পারেন কি না বলিতে পারি

না। ভ্রমর হিন্দু পত্নী বলিয়াই ভ্রমরের হৃদয় এই রহস্যপূর্ণ। অপরাধী পতির উপর এত রাগ সত্ত্বে এত প্রেম, এত ভক্তি, এক হিন্দু পত্নী ভিন্ন আর কোন পত্নীর হয় না। ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, সর্ব্বত্রই দেখি, যেখানে পতির উপর বিষম রাগ, সেই থানেই পতির প্রতি বিষম ঘৃণা, বিষম বিরাগ। কিন্তু বঙ্গে হিন্দুর গৃহে অপরাধী পতির উপর বিষম রাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় প্রেম ও পূর্ণ ভক্তি দেখিতে পাই। প্রেমের এ লক্ষণ, এ মূর্ত্তি এক হিন্দু পত্নী ভিন্ন আর কোন পত্নীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় দেখিতে পাইবারও নয়। হিন্দু পত্নী একটি প্রেম-রহস্য—হিন্দু ভিন্ন সে রহস্য আর কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইবার নয়। হিন্দু পত্নীকে যে না বুঝে সে প্রেমতত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় বুঝে না, বুঝিতে পারেও না। সে বোধ হয় প্রকৃত ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে পারে না।

দেখিলাম সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই হিন্দু পত্নী—পতির বিষম অপরাধ সত্ত্বেও উভয়েরই পতির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং অসীম ভক্তি। কিন্তু পতি অপরে আসক্ত বলিয়া একজনের পতির উপর বিষম রাগ, আর একজন পতির প্রতি শুধু রাগ-শূন্য তা নয়, স্বয়ং পতির আসক্তি চরিতার্থ করাইবার জন্য প্রয়াসী। এ প্রভেদের কারণ কি? ভ্রমরের প্রেম কি স্বার্থ-দুষ্ট? সেই জন্যই কি পতির উপর ভ্রমরের এত রাগ? ভ্রমরের প্রেমে ত স্বার্থ খুঁজিয়া পাই না। যাহার পতিপ্রেম স্বার্থদুষ্ট, পতি তাহার স্বার্থে আঘাত করিলে পতির প্রতি তাহার প্রেমও থাকে না, ভক্তিও থাকে না। বস্তুত তাহার পতিপ্রেম ও পতিভক্তি প্রকৃত প্রেম ও ভক্তিই নয়। এমন নিদারুণ মর্ম্মা-

ঘাত পাইয়া যে ভ্রমরের পতির প্রতি সমান প্রেম ও সমান ভক্তি সে ভ্রমরের পতিপ্রেম স্বার্থদুষ্ট হইতেই পারে না। তবে কেন পতির উপর ভ্রমরের এত রাগ? বোধ হয় ভ্রমরের একটী কথায় এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়—

গোবিন্দলাল। আমি চলিলাম।

ভ্রমর। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা, তোমার দাসানুদাসী,—তোমার কথার ভিখারী,—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি? বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর, কিন্তু উপরে দেবতা আছেন।

ভ্রমরের এই শেষ কথাগুলিতে ভ্রমরের রাগ ও অভিমানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমর গোবিন্দলালকে এমন কথা বলেন না যে আমি তোমার পত্নী, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তিনি বলেন—আমি নিরপরাধিনী, আমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। অধর্ম্মের উপর ভ্রমরের বিষম রাগ বলিয়া ভ্রমরের পতির উপরও বিষম রাগ। ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা পতিতে অধর্ম্মের সঞ্চার দেখিতে পারে না। ইহা প্রেমধর্ম্মের একটি লক্ষণ।—আমরা বাঙ্গালি, অধঃপতিত অকর্ম্মণ্য অন্তঃসারশূন্য—আমাদের কিন্তু একটি আশা ভরসার কথা এই যে আমরা গৃহে গৃহে এখনও প্রেমধর্ম্মের এই লক্ষণটি দেখিতে পাইতেছি।

সূর্য্যমুখী কি ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা নন? তবে কেন ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার পতির উপর রাগ হইল না? গোবিন্দলাল যেমন পাপী, নগেন্দ্রনাথও ত তেমনি পাপী। তবে কেন নগেন্দ্রনাথের উপর সূর্য্যমুখীর রাগ হইল না? কেন হইল না, এ কথার সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার স্থান এ প্রবন্ধ নয়। এ প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিতেছি যে অনেক ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা যেমন পতিতে অধর্ম্মের সঞ্চার দেখিতে পারেন না, অনেকে আবার তেমনি পতির দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ বা যন্ত্রণা দেখিতে পারেন না—পতির দুঃখ, কষ্ট, বা যন্ত্রণা দুষ্প্রবৃত্তিজনিত হইলেও তাঁহারা তাহা দেখিতে পারেন না, আপনারাই তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাও প্রেমধর্ম্মের একটি লক্ষণ। আমরা বাঙ্গালি—নিতান্ত অসার ও দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু আমাদের কপালের বড় জোর যে এখনও আমরা গৃহে গৃহে প্রেমধর্ম্মের এই লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু অতি বড় কপালও ফাটে।

দেখা গেল যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়ে একই ছাঁচের হিন্দু পত্নী। কিন্তু এক ধাতুর নয়। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিপ্রেমে আত্মহারা—উভয়েরই পতিভক্তি অপরিমেয়। কিন্তু পতি অধর্ম্মাচরণ করিলে সূর্য্যমুখী পতির নিকট তেমনি শান্ত, প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়কারিণী—ভ্রমর পতির উপর রুক্ষ ও রাগান্বিত। ছাঁচ এক বটে কিন্তু ধাতু বড় বিভিন্ন। সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধাতুর পত্নীই আদর্শ পত্নীরূপে বর্ণিত। ভ্রমর যে ধাতুর পত্নী, সে সাহিত্যে তাহার বড় বেশী প্রশংসা নাই। পূর্ব্বকালে সে ধাতুর পত্নী বেশী ছিল কি না বলিতে পারি না।

এখন কিন্তু বেশী বলিয়া বোধ হয়। আমাদের শ্রীমতীরা শান্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়িয়া দুর্দ্দান্ত ইউরোপীয় চিকিৎসারই বেশী পক্ষপাতিনী। তবে যে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এমন কথা বলি না—আমি শ্রীমতী-দিগের কলঙ্ক রটনা করিতে বসি নাই—এমন কথা কি আমি বলিতে পারি? তাঁহারা নরম গরম দুই রকম চিকিৎসাই করিয়া থাকেন, তবে কি না গরমের দিকেই যেন একটু ঝোঁক্।

সে যাহাহউক—যে দুই ধাতুর পত্নীত্ব বর্ণনা করিলাম তন্মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট কোন্‌টি নিকৃষ্ট, অথবা দুইটিরই সমান উৎকর্ষ কি না, তাহার বিচার এপ্রবন্ধে করা যাইতে পারে না। সে বিচার বড় কঠিন। সে বিচার স্থানান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। এস্থলে কিন্তু একটী কথা বলা আবশ্যক। উপরে বলিয়াছি যে একই বিড়ম্বনায় পড়িয়া সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর দুই জনের আচরণ ভিন্নরকম এবং আচরণের ফলও ভিন্ন রকম হই-য়াছিল। সূর্য্যমুখীর আচরণে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, নগেন্দ্রের যে বংশে জন্ম, সকলই রক্ষা পাইল।—সে আচরণের ফলে যে যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরমসুখে পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গেল—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায় বংশ লোপ হইল, কৃষ্ণ-কান্ত রায়ের নাম ডুবিল, একটা সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য্য ছারখার হইয়া গেল!

বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ এই শোচনীয় প্রভেদ ভাবিয়া সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধাতুর পত্নীত্বের এত গৌরব করা হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু প্রাচীন কালের লোক নহেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমাদের সমসাময়িক লোক। এখনও প্রতিভায় দেশ আলোকিত করিতেছেন এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আরো বহু দিন ধরিয়া এই রকম করিয়া দেশ আলোকিত করেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজি বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত। শৈশব হইতে ইংরাজি শিখিয়া হিন্দু ধাৎ রক্ষা করা ভার। তাই আজিকার বাঙ্গালা সাহিত্যে খাঁটি লেখা এত কম। কিন্তু দেখিলাম যে বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী আদর্শানুযায়ী হিন্দু পত্নী এবং তাঁহার ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দু পত্নী বটে। অতএব বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এই দুইখানি পুস্তককে যদি উপন্যাস বল, তবে দুইখানিই হিন্দু উপন্যাস, যদি কাব্য বল, তবে দুইখানিই হিন্দু কাব্য।

এ বড় কম আশা, স্পর্দ্ধা ও আহ্লাদের কথা নয়।

সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে মানুষ সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ চিরকাল বলিয়া আসিতেছে যে সুখ পৃথিবীতে নাই, যদিও থাকে, বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে ভগবান মানুষের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, দুঃখই লিখিয়াছেন। তাই মানুষ চিরকাল দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে।

ধর্ম্মযাজকেরা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে বলিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে সুখ নাই, সুখ স্বর্গে—এজন্মে সুখ নাই, সুখ মৃত্যুর পর পরলোকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন যে এ জন্মটায় মানুষের কেবল পরীক্ষা, সেই পরীক্ষার ফল স্বরূপ মানুষের সুখ দুঃখ মানুষের মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মযাজক নহেন, এমনি তোমার আমার মতন মানুষ, তাঁহারা সুখ খুঁজিয়া বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ কোন স্থানে বা কোন জিনিসে লুকান আছে। আবার কোন্ স্থানে বা কোন্ জিনিসে সুখ লুকান আছে ঠিক করিতে না পারিয়া, তাঁহারা সুখের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির, সর্ব্বদাই লালায়িত, সর্ব্বদাই সন্তপ্ত! তাঁহারা কখনও এ জিনিসটা দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ আছে কি না, কখনও ও জিনিসটা দেখিতেছেন, উহাতে সুখ আছে কি না, কখনও এ-কাজটা করিয়া দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ পাওয়া যায় কি না, কখনও ও-কাজটা করিয়া দেখিতেছেন, উহাতে সুখ পাওয়া যায় কি না। এত দেখিয়াও হয়ত সুখ

পান না, আর যদিও পান, হয়ত সে সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত, নয় দুই দিনের বেশি থাকে না! তাই তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীতে সুখ নাই, থাকিলেও না থাকারই মধ্যে।

কিন্তু প্রকৃত কথাটা কি? সুখ কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে নাই? থাকিলেও, তাহা কি এতই দুষ্প্রাপ্য, পরিমাণে এতই কম? সুখকে কি এতই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়? না, তা নয়। পৃথিবীতে সুখের পরিমাণ নাই—সুখ যথার্থই অপরিসীম। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে, এই অনন্ত জগতে সুখের ছড়াছড়ি, সুখের ঢালাঢালি, সুখের গড়াগড়ি। এই অসীম অনন্ত জগৎ—অসীম অনন্ত সুখের অসীম অনন্ত হাট। এ অসীম অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডরূপ সুখের হাটে কত জিনিস আছে বল দেখি? কত রকমের জিনিস আছে বল দেখি? কার সাধ্য বলে কত জিনিস কার সাধ্য বলে কত রকমের জিনিস! আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র দেশের একটা ক্ষুদ্র বিভাগের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে কত জিনিস এবং কত রকমের জনিস আছে বল দেখি? কত গাছ এবং কত রকমের গাছ আছে বল দেখি? কত লতা এবং কত রকমের লতা আছে বল দেখি? কত পাতা এবং কত রকমের পাতা আছে বল দেখি? কত পাখী এবং কত রকমের পাখী আছে বল দেখি? আর জিজ্ঞাসাই বা করিব কত? জগতে জিনিসের সংখ্যারও সংখ্যা নাই, জিনিসের রকমেরও সংখ্যা নাই। তাই বলি যে এই অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত হাট, এবং এই অসীম অনন্ত হাট অসংখ্য দ্রব্যে ভরা। এই অসংখ্য-দ্রব্য-পূর্ণ হাটের বিশালতা ভাবিয়া দেখিতে গেলে মন স্তম্ভিত হইয়া যায়, অন্তঃ-

করণ আনন্দমাখা-গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠে। এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। অভ্রভেদী অসীমকায় হিমাচলও যেমন অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণাও তেমনি অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। কথাটা কি কিছু অসঙ্গত বোধ হইল ? তবে বুঝাই শুন। অসীম-কায় হিমাচলে জগদীশ্বরের অসীম শক্তি দেখিতে পাও বলিয়া হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণে এত সুখ উছলিয়া উঠে। কিন্তু বিন্দুবৎ বালির কণাতেও কি জগদীশ্বরের অসীম শক্তি দেখিতে পাও না ? তবে কেন হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণে যেমন সুখ উছলিয়া উঠে, বালির কণাটি দেখিলেও অন্তঃকরণে তেমনি সুখ উছলিয়া উঠে না ? তবেই ত বলিতে হয় যে অসীমকায় হিমা-চলকে যে চক্ষে দেখ, বিন্দুবৎ বালির কণাটিকে সে চক্ষে দেখ না। অতএব এ কথা ঠিক যে, যে চক্ষে হিমাচল দেখ, সেই চক্ষে বালির কণা দেখিলে হিমাচল হইতে যত সুখ পাও বালির কণা হইতেও তত সুখ পাইবে। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে জগতে যাহা কিছু আছে সকলই অসীম, সসীম কিছুই নাই। অনন্ত বিশ্বমণ্ডলও যেমন অসীম, বিন্দুবৎ বালির কণাটিও তেমনি অসীম। বালির কণাটিকে যে ক্ষুদ্র বা সসীম বল, সে কেবল চর্ম্মচক্ষের ভাষায় বল, মনশ্চক্ষের ভাষায় সেও অসীম। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার আলোচনা নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। কথাটা বড়ই ঠিক—কিন্তু আরও অনেকটা বাড়া-ইয়া লওয়া যায়। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘাতে বা প্রত্যেক বালির

কণাতে শুধু বিশ্ব বর্ত্তমান নয়, স্বয়ং বিশ্বনাথ বর্ত্তমান। অতএব চর্ম্মচক্ষের মোহ এবং দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতের কোন পদার্থকে সসীম বলিয়া দেখিবে না, জগতের সকল পদার্থকেই অসীম বলিয়া দেখিবে, জগতে সীমা বলিয়া একটা জিনিসই দেখিতে পাইবে না। তখন ক্ষুদ্রতম বিন্দুবৎ বালির কণাতেও অসীমত্ব দেখিবে এবং অসীমত্বে মজিলে যে অসীম সুখ ও অসীম আনন্দ হয়, ক্ষুদ্রতম বালির কণা দেখিলেও সেই অসীম সুখ ও অসীম আনন্দে মজিবে। তাই বলিতেছি যে এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। এ হাটে সুখের সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, চক্ষু মেলিলেই অসংখ্য সুখের সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। যেটিকে ইচ্ছা লও, সেইটিকে লইয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ পাইবে। আর, সকলগুলিকে লইতে ইচ্ছা হয়, সকল গুলিকেই লও, অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ পাইবে। আবার এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তাহারা সুখের বিনিময়ে তোমার কাছে আর কোন মূল্য চায় না, কেবল ঈশ্বরে তন্ময়ত্ব চায়। সেই তন্ময়ত্ব লাভ কর, ঈশ্বরের এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে তাহারা সকলেই তোমাকে অকাতরে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিনামূল্যে অসীম মাত্রায় বিক্রয় করিবে। জগৎ কাহাকে বলে, জগদীশ্বর কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে মানুষ বুঝে না বলিয়া এই অসীম অনন্ত সুখের হাটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া 'জগতে সুখ নাই' 'জগতে সুখ

নাই' বলিয়া চিরকাল কাঁদিতেছে এবং অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!

জগতে যত দ্রব্য আছে সকলেই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ দান করে, এ কথাটি ঠিক কি না একটু ভাল করিয়া দেখা যাক। যাঁহারা ইংরাজি সাহিত্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে একটা গোলাপ ফুল দেখিলে যে আনন্দ যে সুখ্ হয়, একটা আকন্দ ফুল দেখিলেও কি সেই আনন্দ সেই সুখ হইতে পারে? একটা পর্ব্বত দেখিলে যে আনন্দ যে সুখ হয়, একটা মাটির ঢিবি দেখিলে কি সেই আনন্দ সেই সুখ হইতে পারে? গোলাপ ফুল সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, অতএব পাহাড় ও গোলাপ ফুল দেখিলে সুখ হয়; আকন্দ ফুলও সুন্দর নয়, মাটির ঢিবিও সুন্দর নয়, তবে কেমন করিয়া আকন্দ ফুল বা মাটির ঢিবি দেখিলে সুখ হইবে? Beauty বা সৌন্দর্য্য বলিয়া একটা জিনিস আছে সেটা কিন্তু পৃথিবীর সকল পদার্থে নাই। যে পদার্থে তাহা আছে মানুষ সেই পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করে; যে পদার্থে তাহা নাই, মানুষ সে পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যের যে ভাগকে æsthetic বা fine art বলে সেই ভাগে এই সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের সেই ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন যে, সকল পদার্থ যখন সুন্দর নয়, তখন সকল পদার্থই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ দান করিতে পারে, এরকম কথা বলা অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু একথার একটি উত্তর আছে। জগতে যে সকল পদার্থ আছে,

সেই সকল পদার্থকে যদি কেবল চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখ তবে তাহাদের অনেককে সুন্দর এবং অনেককে অসুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হইবে। চর্ম্মচক্ষে একটা গোলাপ ফুল বা একটা পর্ব্বত যেমন সুন্দর, একটা মাটির ঢিবি বা একটা আকন্দ ফুল তেমন সুন্দর নয়। অতএব পর্ব্বত বা গোলাপ ফুল দেখিলে যেমন সুখ হইবে, মাটির ঢিবি বা আকন্দ ফুল দেখিলে তেমন সুখ হইবে না। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিলে গোলাপ ফুলও যেমন সুন্দর, আকন্দ ফুলও তেমনি সুন্দর দেখিবে। চর্ম্মচক্ষে আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতি দেখা যায়। আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতির কমবেশী ভালমন্দ ইতরবিশেষ আছে। অতএব যে সকল জিনিস চর্ম্মচক্ষে দেখ, তাহা সমান সুন্দর এবং সমান প্রীতিকর না হইতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে হয়ও না। কিন্তু সকল পদার্থের মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মপদার্থ মানসচক্ষে দেখ, তাহার আর কমবেশী ভালমন্দ ইতরবিশেষ নাই, তাহার পরিমাণও অসীম, সৌন্দর্য্যও অসীম। অভ্রভেদী অনন্তকায় হিমাচলস্থিত ব্রহ্মপদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, বিন্দুবৎ বালুকা-কণাস্থিত ব্রহ্মপদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। কোকিলের কলকণ্ঠস্থিত ব্রহ্মপদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, কাকের কর্কশ কণ্ঠস্থিত ব্রহ্মপদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলস্থিত ব্রহ্মপদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, পঙ্কিল পল্বলের জলস্থিত ব্রহ্মপদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। অতএব মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতে যত পদার্থ আছে সবই সমান সুন্দর। এবং মনশ্চক্ষে দেখিলেই এই অসংখ্য পদার্থ-পূর্ণ অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যের মেলা। উপরে যে

অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাটের কথা বলিয়াছি, সে এই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলারই নাম। এই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব জগত অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলা বলিয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট হইয়াছে! এমন হাটে আসিয়া আবার সুখ খুঁজিতে হয়, না সুখের জন্য কাঁদিতে হয়!

তবে চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় তাহা কি কিছুই নয়? কিছুই নয় এমন কথা বলি না। তাহাও খুব ভাল জিনিস এবং তাহা দেখিলেও খুব সুখ হয়। কেনই বা না হইবে? তাহাতেও ত সেই অসীম অনন্ত সুন্দর ব্রহ্মপদার্থ রহিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা আছে। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে সৌন্দর্য্য যদি তোমাকে আর কোন রকম সৌন্দর্য্য দেখিতে না দেয়, তবে সে সৌন্দর্য্যকে সৌন্দর্য্য বলিয়া গণনা না করাই ভাল, সে সৌন্দর্য্য না দেখাই উচিত। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে পদার্থে সে সৌন্দর্য্য নাই সে পদার্থে যে ব্যক্তি কোন রকম সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, তাহাকে যত বড় কবি বা সুরুচিসম্পন্ন মানুষ বল না কেন সে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ নয়। তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় নাই বলিলেই হয়। যে সৌন্দর্য্য চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়, আমার বোধ হয় যে ইউরোপীয় সাহিত্যের æsthetic বা চিত্তরঞ্জণকারী ভাগ মানুষকে সেই সৌন্দর্য্যের কিছু বেশী পক্ষপাতী করিয়া তুলে। এবং সেই জন্য ইউরোপীয়েরা পদার্থকে সুন্দর এবং অসুন্দর বলিয়া যত পৃথক্ করিয়া থাকে, এদেশের লোক তত করে না, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যেও সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের যত প্রভেদ এবং সুরুচি

কুরুচি লইয়া যত গণ্ডগোল দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুর সাহিত্যে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সংস্কৃত কাব্যে সে সৌন্দর্য্যের অপরিমিত সমাবেশ আছে। কিন্তু যে পদার্থে তাহা নাই, সে পদার্থের প্রতি ইউরোপীয় সাহিত্যে যেরূপ ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্য কিছু বেশী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বাহ্যজগৎ এবং বাহ্যসৌন্দর্য্য সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু বেশী মনের দিক্ দিয়া বর্ণিত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে কিছু বেশী চর্ম্মচক্ষের দিক্ দিয়া বা বাহ্যেন্দ্রিয়ের দিক্ দিয়া বর্ণিত হয়। ইউরোপীয় কবি সূর্য্যাস্তের শোভা কেবল চোক্ দিয়া দেখিতে বলেন; হিন্দু কবি ম্রিয়মাণ কমলিনীর জন্য এবং বিচ্ছেদগ্রস্ত চক্রবাক চক্রবাকীর জন্য না কাঁদিয়া শুধু চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিতে বলেন না। রং শুধু রং বলিয়া, আকার শুধু আকার বলিয়া, অবয়ব শুধু অবয়ব বলিয়া, রূপ শুধু রূপ বলিয়া, লাবণ্য শুধু লাবণ্য বলিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যে যত প্রশংসিত সংস্কৃত সাহিত্যে তত প্রশংসিত হয় না। হিন্দু সকল পদার্থে ব্রহ্মপদার্থ দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের প্রভেদ নাই এবং চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে সৌন্দর্য্যের একাধিপত্যও নাই। ইউরোপবাসী জগৎ হইতে জগদীশ্বরকে পৃথক দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের এত প্রভেদ এবং চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার এত আধিপত্য। ঈশ্বর

সম্বন্ধীয় সংস্কারের প্রভেদ বশত নানা বিষয়ে কত গভীরতরও গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়া পড়ে এখন বুঝিতে পারিবে।

তাই বলি যে, যে শাস্ত্র মানুষকে বাহ্যসৌন্দর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী করে, সে শাস্ত্র বড়ই অনিষ্টকর, সে শাস্ত্র অতি সাবধানে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বাহ্যসৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইলে তোমাকে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, কেন না সকল পদার্থের বাহ্যসৌন্দর্য্য নাই। অতএব যে শাস্ত্র তোমাকে বাহ্যসৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী করে সে শাস্ত্র তোমার সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া দেয় এবং সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া তোমাকে অস্থির এবং অসুখী করে। সে শাস্ত্রের ভক্ত হইলে এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মেলা ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আর তুমি জীব-প্রধান মানুষ, তুমি কি কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের গুণে জীবপ্রধান? তোমার মন, তোমার জ্ঞান, তোমার হৃদয় লইয়াই কি তুমি জীব মধ্যে প্রধান নও? তবে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ দেখিলে জীব মধ্যে তোমার প্রধান্যই বা কেমন করিয়া হয়, আর তোমার জগৎ-দেখা কার্য্যটা মানুষের জগৎ-দেখা কার্য্যই বা কেমন করিয়া হয়? চর্ম্মচক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় সে সৌন্দর্য্যেও ব্রহ্মপদার্থ আছে, অতএব সে সৌন্দর্য্যও দেখ, সে সৌন্দর্য্যও ভালবাস। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া মনশ্চক্ষু এবং হৃদয় দিয়া যে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য দেখা যায়, সে সৌন্দর্য্য দেখিতে যদি না পাও, তবে জানিও যে মানবোচিত উৎকৃষ্ট প্রকৃতিও তুমি পাও নাই এবং উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষের জন্য যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট

এবং সৌন্দর্য্যের মেলা খোলা রহিয়াছে সে হাটে এবং মেলায় প্রবেশ করিবার অধিকারও তোমার হয় নাই। হিন্দু ঋষিরা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানস-চক্ষে দেখিতেন, এবং মানসচক্ষে দেখিয়া জগৎকে সুখময় দেখিতেন, জগতে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। ইউরোপের মহাপুরুষেরা খুব মহৎ হইয়াও মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করেন নাই বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানস চক্ষে না দেখিয়া চর্ম্মচক্ষে দেখেন এবং সেই জন্য জগৎকে সুন্দর অসুন্দর সুখময় দুঃখময় দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জগতে সুখ ও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ান এবং সুখের অনুসন্ধানে সদাই অস্থির ও অসুখী হইয়া থাকেন। ইউরোপে মানবের আধ্যাত্মিকতা কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যার এত প্রাধান্য; ভারতে মানবের আধ্যাত্মিকতা বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যা নাই বলিলেই হয় এবং æsthetic বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায় এক রকম লয় হইয়া গিয়াছে। আজিকার দিনে আমরা æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যায় তত লয় করিয়া দিতে পারিব কি না, ঠিক ব‍ি‍তে পারি না, এবং ততটা লয় করিয় দেওয়াও আবশ্যক কি না ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যা হইতে পৃথক করি আর নাই করি, উহাকে পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন না করিলে আমরা মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব না এবং এমন যে অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্য্যের মেলা খোলা রহিয়াছে ইহাতেও প্রবেশ করিতে পারিব না। সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরিব, অসুখেই কাল কাটিবে!

ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

জগতে জড়ের পরিমাণ ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই দেখি জড়। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি ইহাতে কতই জড়—কতই মাটি, কতই জল, কতই প্রস্তর, কতই কাষ্ঠ, কতই অস্থি, কতই মাংস, কতই রক্ত, কতই ফুল, কতই ফল, কতই বাতাস, কতই বহ্নি—জড়ের সীমা নাই, সংখ্যা নাই, শেষ নাই। আবার এমন কত পৃথিবীই আছে—এ পৃথিবী অপেক্ষা দশ গুণে বড়, শত গুণে বড়, সহস্র গুণে বড়। এক একটা সূর্য্যমণ্ডল কি ভয়ানক জড়পিণ্ড! এমন কত সূর্য্যমণ্ডলই আছে। এক একটা নক্ষত্র কি প্রকাণ্ড জড়রাশি। এমন কত নক্ষত্রই আছে। শূন্য আকাশটাও শূন্য নয়——জড় বায়ুতে, জড় বিদ্যুতে, জড় আলোকে, জড় ইথরে ভরা। জগতে সবইত জড়। জড় অনন্ত, জড় অসীম। সেই পরম চৈতন্যময় মহাপুরুষই ত এই প্রকাণ্ড জড় রাশি সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই প্রকাণ্ড জড়রাশি কি শুধুই জড়? জড়ে কি কেবল জড়ত্বই আছে? জড়ে যদি শুধু জড়ত্বই থাকে তবে জড় ত চৈতন্যময়ের সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট পদার্থে থাকিবেনই থাকিবেন। কার্য্যে কারণ থাকিবেই থাকিবে। তবে কেন বল জড় কেবলই জড়?

না, না, জড় কেবলই জড় নয়। তাহা হইলে এত জড়ের মধ্যে থাকিয়া চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষের অধোগতির কি সীমা থাকিত, না স্বয়ং চৈতন্যময়ের চৈতন্য অবিকৃত থাকিত? না, না,

জড় শুধু জড় নয়। জড়ের আত্মা আছে, জড়ের আধ্যাত্মিকতা আছে। জড়ে আত্মা আছে বলিয়াই, জড়ে আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই জগতে জীব এবং জগতে চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষ উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে। জীবে যে চৈতন্য আছে নির্জীবে তাহা নাই। চৈতন্যের গুণে জীবের চৈতন্য, একথা সত্য। কিন্তু জীবের জড়ত্ব নির্জীবের জড়ত্ব হইতে ভিন্নও ত বটে। জীবের জড়ত্বের গুণ প্রকৃতি এবং মূর্ত্তি নির্জীবের জড়ত্বের গুণ প্রকৃতি এবং মূর্ত্তি হইতে বড়ই ভিন্ন। জীবের জড়ত্ব এবং নির্জীবের জড়ত্ব দুই ভিন্ন শ্রেণীর জড়ত্ব বলিয়া মনে হয়। গোড়ায় দুই জড়ত্বই এক, কিন্তু গোড়ার জড়ত্ব জীবে এতই পরিবর্ত্তিত যে তাহাকে আর গোড়ার জড়ত্ব বলিয়া চেনা যায় না। খানিকটা মাটি বা পাথর বা জল আর জীবশরীর তুলনা করিয়া দেখিলে জড়ের এই যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি তাহা উপলব্ধি হইবে। মাটি পাথর বা জল কি জিনিস আর জীবশরীরই বা কি জিনিস? কে বলিবে দুই জিনিস এক রকমের, এক প্রকৃতির, এক শ্রেণীর? না, জীবের জড়ত্ব নির্জীবের জড়ত্ব হইতে অনেক বিভিন্ন। এই বিভিন্নতায় জড়ের আত্মা আধ্যাত্মিকতা এবং আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। চৈতন্যের সহিত থাকিতে হইলে, চৈতন্যকে পুষিতে হইলে, চৈতন্যকে ধারণ করিতে হইলে নির্জীব জড়কে অনেক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়। সেই পরিবর্ত্তনই জড়ের উন্নতি। সে উন্নতি আত্মার সহিত সহবাসের জন্য এবং আত্মাকে আশ্রয় দিবার জন্য। জড়ের সেই পরিবর্ত্তনরূপ উন্নতি না হইলে জগতে আত্মার আবির্ভাবও হয় না আশ্রয়স্থানও থাকে না। আত্মার উপযোগী জড়ত্ব ব্যতীত জগতে আত্মার

বিকাশ হয় না। নির্জীব জড় চিরকাল সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই আত্মার-উপযোগী-জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। Evolution বা ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতিতে সেই চেষ্টা এবং অগ্রবর্ত্তিতা ব্যক্ত হইতেছে। সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করার এবং সেই আত্মার-উপযোগী-জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই জড়ের আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। জড়ে আত্মা না থাকিলে তাহার কি এই আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা থাকিত? জড়ে আত্মা আছে বলিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিকতাও আছে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাও আছে। এবং জড়ে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া মানুষও এই বিপুল জড়রাশির মধ্যে থাকিয়া জড়ে পরিণত হয় না, চৈতন্যময়ের চৈতন্যও বিকার প্রাপ্ত হয় না। জড় জগৎও সেই জন্য চৈতন্যময়কে দেখাইতে এত ভালবাসে এবং মানুষ জড় জগতে চৈতন্যময়কে দেখিলে মানুষের চৈতন্যময়ও বিকৃতি প্রাপ্ত হন না। যে জড়ের প্রকৃতি এবং আকাঙ্ক্ষা বুঝে কেবল সেই জড়ত্ব কর্ত্তৃক পরাভূত হয় না, কেবল সেই এই বিপুল জড় রাশির জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতাকে আপনার আধ্যাত্মিকতার সহিত মিশাইয়া লয় এবং কেবল সেই আপনার অন্তরেও যে চৈতন্যময়কে দেখে, জড়েও সেই চৈতন্যময়কে দেখে। তাহার কাছে চৈতন্যময়ের ধ্যানের সাকার নিরাকার উভয় পদ্ধতিই সমান।

সমস্ত জড় জগতের যেমন মানবদেহেরও তেমনি আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে। মনুষ্যের এমন একদিন গিয়াছে যখন তাহার হস্ত পদ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় কেবল

দেহের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। তখন আহার বিহার বই মনুষ্যের অন্য কাজ ছিল না। তখন আহার বিহারে এবং আহার বিহারের উপকরণ সংগ্রহেই মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ আসক্তি এবং পরিতৃপ্তি ছিল। ক্রমে সে দিন গিয়া মনুষ্যের অন্য দিন হয়। তখন আহার বিহার ছাড়া জ্ঞানোপার্জ্জন প্রভৃতি উন্নত বিষয়েও মনুষ্যের ইন্দ্রিয় নিযুক্ত হইয়াছিল। শুধু আহারবিহারে তখন আর মানবেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় নাই—আহারবিহারকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিয়া মানবেন্দ্রিয় তখন জ্ঞানোপার্জ্জন প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ের অনুরাগী হইয়া তাহারই অনুধাবনে সম্পূর্ণ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক আসক্তিও বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের এই আধ্যাত্মিক আসক্তির বিকাশ কেবল মাত্র মানসিক শক্তির বিকাশের ফল বা অনুসরণ নয়। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি না থাকিলে মন আপন বিকাশ-ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়ের সহায়তা পাইত না এবং তাহা হইলে সে বিকাশ-ক্রিয়া অত্যল্প পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া বন্ধ হইয়া যাইত। অতএব ইন্দ্রিয়ের নিজের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি স্বীকার করিতেই হয়। আর যদি ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তিকে মানসিক শক্তির ফল বা অনুসরণ মাত্র বিবেচনা কর, তবে ইন্দ্রিয় এবং মানসিক শক্তিকে এতই সম্বদ্ধ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হয় যে মনকে আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়কেও আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার না

করিলে চলে না। অতএব যে ভাবেই দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তি অস্বীকার করা যায় না। তাই বলি যে মানব মনের আধ্যাত্মিকতা যত বৃদ্ধ হয় মানবেন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তিও তত বৃদ্ধি হয়। মনুষ্য জাতির ইতিহাসও এই সত্য ঘোষণা করে। মনুষ্যের মনের এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব যোগ আছে বলিয়া মনুষ্যের মন যখন ভগবানে ভোর হয় তাহার ইন্দ্রিয়ও তখন ভগবানকে লইয়া থাকে, তাহার ইন্দ্রিয় তখন ভগবান ছাড়া আর কিছুতেই সারবত্তা দেখে না এবং আর কিছু লইয়া আনন্দিত বা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন মনও ভগবানময় হয়, ইন্দ্রিয়ও ভগবানময় হয়। তখন জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ থাকে না। তখন কি জড় কি চৈতন্য কি ইন্দ্রিয় কি মন সকলই প্রেমভক্তিতে গলিয়া এক ভেদ-শূন্য ভক্তরূপে ভগবানের পাদপদ্মে লুটাইতে থাকে। তখন জড়ও থাকে না চৈতন্যও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না মনও থাকে না। তখন এক ভক্তি, ভক্তি, ভক্তিই থাকে। তখন ভগবানের পদে ভক্তির আহুতিতে জড়ও লয় হইয়া যায়, চৈতন্যও লয় হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়ও লয় হইয়া যায়, মনও লয় হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্তিরূপ উৎসর্গে জড়ও যা চৈতন্যও তাই, ইন্দ্রিয়ও যা মনও তাই। সে উৎসর্গে জড় ও চৈতন্য, মন ও ইন্দ্রিয় একই বস্তু—প্রভেদ শূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। ভাগবতে ইন্দ্রিয়ের এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা দেখিতে পাই।

বিলেবেতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন যোপগায়ত্যরুগায় গাথাঃ॥

ভারঃ পরং পট্ট কিরীট যুষ্ট মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমে মুকুন্দং।
শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপর্যাং হরেল্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্নিরীক্ষতোযে।
পাদৌ নৃণাং তৌ ক্রমজন্ম ভাজৌ ক্ষেত্রানি নানুব্রজতোহরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণূন্ নজাতু মর্ত্যোভি লভেত যস্ত।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছ যো যস্ত নবেদ গন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ।
নবিক্রিয়েতাথ যদাবিকারং নেত্রে জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥

(২ স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়, ২০—২৪)

যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেক জিহ্বার তুল্য। আর যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয় তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কীরিটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র, আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে তাহা কাঞ্চন কঙ্কণে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃতকের হস্ত তুল্য হয়। অপর যে দুই নয়ন শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তির দর্শন না করে তাহা ময়ূর পুচ্ছের সদৃশ, বস্তুত তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে তাহারা বৃক্ষবৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। অপর হে সূত! যে ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্তের পাদরেণু ধারণ না করে সে ব্যক্তি জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই মৃতক তুল্য, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে নিশ্বাস সত্বেও শবশরীরী সদৃশ। হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকার হইলেও

যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্র লোমাঞ্চ না হয় তবে সে হৃদয় পাষাণের তুল্য কঠিন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

ভক্তের দেহের ও ইন্দ্রিয়ের এই আকাঙ্ক্ষা, আধ্যাত্মিকতা। ভক্তের সবই ভগবানের—মনও ভগবানের দেহও ভগবানের। তাই ভক্তের মনও ভগবানের পাদপদ্মে লুটায় দেহও ভগবানের পাদ-পদ্মে লুটায়। ভক্ত এক ভগবানকে বই আর কাহাকেও জানেন না। তাই তাঁহার যা কিছু আছে সবই তিনি ভগবানকে উৎসর্গ করেন। তুমি ভগবদ্ভক্ত, ভাগবতকারের ন্যায় তোমার যদি ভগবানের গঠিত মূর্ত্তি না থাকে তথাপি তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। ভগবদ্ভক্ত সাকারবাদীই হউন আর নিরাকারবাদীই হউন, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বৃক্ষলতায় সমুদ্র-সরোবরে পাহাড়-পর্ব্বতে ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখাকে চক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রিয় কার্য্য মনে করেন, পক্ষীর কূজনে এবং নির্ঝরিণীর ঝর ঝর শব্দে স্রোতস্বতীর কলকল কল্লোলে ভগবানের মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করাকে কর্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রিয় কার্য্য মনে করেন, পুষ্পের সৌরভে ভগবানের সৌন্দর্য্যের সৌরভ আঘ্রাণ করাকে নাসিকার সর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান ও প্রিয় কার্য্য মনে করেন। ইংরাজ কবি কাউপর ও বার্দস্বার্থ এই মনে করিয়া জগতে জগদীশ্বরকে দেখিয়া-শুনিয়া বেড়াইতেন। নতুবা তাঁহাদের চক্ষু কর্ণাদির সার্থ-কতা ও পরিতৃপ্তি হইত না। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত জড় চৈতন্যের প্রভেদ জানেন না। প্রভেদ থাকে তাঁহার ভগবানই তাহা জানেন। তিনি তাঁহার মনও যেমন ভগবান হইতে পাইয়াছেন

দেহও তেমনি ভগবান হইতে পাইয়াছেন। অতএব তাঁহার মনকেও যেমন তিনি তাঁহার ভগবানকে আহুতি দেন, দেহকেও তেমনি তাঁহার ভগবানকে আহুতি দেন। দেহকে আহুতি না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তাই তিনি বাহ্যজগতে ভগবানকে না দেখিয়া না শুনিয়া অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্পোৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার ভগবানের এত সাধের এত সুন্দর এত বৈচিত্র্যময় এত ঐশ্বর্য্যভরা জগতে ভগবানকে চক্ষু ভরিয়া না দেখিলে, কর্ণ ভরিয়া না শুনিলে, অঞ্জলি ভরিয়া জগৎ উপহার না দিলে তাঁহার মনের সাধই বা মিটে কৈ, তাঁহার দেহের সাধই বা মিটে কৈ ? তুমি, জ্ঞানী, সাকারবাদের নিন্দা কর ; কিন্তু তিনি প্রেমিক ও ভক্ত, ভগবানকে চক্ষু দিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারেন কৈ ? তাঁহার ভগবান সাকার বল নিরাকার বল সবই। মন বল দেহ বল ভগবান তাঁহাকে দেখিবার জন্য যত রকম যন্ত্র দিয়াছেন সেই সব যন্ত্র দিয়া ভগবানকে না দেখিলে তাঁহার ভগবানকে দেখিয়া আশ্ মিটে কৈ ? তিনি প্রেমিক ও ভক্ত—তিনি তোমার সাকার নিরাকার-বাদের অত সব মারপ্যাঁচ বুঝেন না—অত সব অসীমত্বসসীমত্বের গণ্ডগোল বুঝেন না—তিনি এক ভগবানের নেশায় ভোর, তিনি এক অসীম ভগবানই বুঝেন, এক অসীম ভগবানেই ভরা, এক অসীম ভগবদ্বস্তু লইয়াই বিহ্বল। তিনি সীমা সরহদ্দের ধার ধারেন কি ? সীমা সরহদ্দই বা তাঁহার করিতে পারে কি ? তাই তিনি তোমার সব বাদাবাদের সীমানা সরহদ্দ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সীমা রহিত হইয়া তাঁহার যা আছে, মন বল, আত্মা বল, চক্ষু বল, কর্ণ বল, নাসিকা বল, হৃদয় বল, সমস্ত

ভরিয়া তাঁহার ভগবানকে দেখেন এবং ধ্যান করেন। তাই ঘোর ভগবদ্ভক্ত তাঁহার মনকেও যেমন ভগবানকে আহুতি দিয়া পবিত্র করেন, তাঁহার দেহকেও তেমনি ভগবানকে আহুতি দিয়া পবিত্র করেন। তাঁহার মনেরও যেমন পবিত্র হইবার বাসনা, তাঁহার দেহেরও তেমনি পবিত্র হইবার বাসনা। সে বাসনার কাছে মনের দেহের প্রভেদ নাই। প্রভেদ থাকিলেও সে বাসনার বলে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং নিকৃষ্ট দেহ উৎকৃষ্ট মনের যে উৎকৃষ্টতা সেই উৎকৃষ্টতা লাভ করে। যে ছোট, ভক্তিবলে সে বড় হইয়া যায়, জগতের দুইটি দৃশ্যমান উপকরণ—জড় ও চৈতন্য—ভক্তিবলে এক হইয়া সেই এক-কে প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই জগতের মুক্তি। ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, ভগবানের কাছে যাইতে হইলে, শুধু মনকে পবিত্র করিয়া লইয়া গেলে চলিবে না, দেহকেও পবিত্র করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ফলত দেহকে পবিত্র না করিলে মনকেও পবিত্র করিতে পারিবে না। দেহকে ভগবদ্ভক্ত না করিলে মনকেও ভগবদ্ভক্ত করিতে পারিবে না। দেহকে মুক্ত করিতে না পারিলে মনকেও মুক্ত করিতে পারিবে না। কঠোর তপস্বীর ন্যায় দেহকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে পাপ হইবে। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করাই মুক্তি। নিকৃষ্ট দেহকে নষ্ট করা অধর্ম্ম। নিকৃষ্ট দেহকে উৎকৃষ্ট করিয়া উৎকৃষ্ট আত্মায় মিশাইয়া ফেলাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং মুক্তি। দেহকে আত্মার আকাঙ্ক্ষায় ভরাইয়া ফেলিতে না পারিলে দেহও আত্মায় মিশে না, মানুষের মুক্তিও হয় না। অতএব দেহ বল, মন বল, তোমার যা আছে সমস্তকে ভগবদ্ভক্ত করিলে তবে তুমি ভগবানকে পাইবে। ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট

দেহকে সেই জন্য উন্নত করিয়া আত্মার আধ্যাত্মিকতায় মিশা-ইয়া দেওয়া চাই। নিকৃষ্ট জড় উৎকৃষ্ট চৈতন্যে না মিশিলে সমস্ত জগৎ জগদীশ্বরে মিশিতে পারিবে না বলিয়া, ভগবান জড়কে এবং মানবেন্দ্রিয়কে আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। সেই আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া মনুষ্যের মনের ন্যায় মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ও ভগবানের পদে আপনাকে আহুতি দেয়। সে আহুতিকে সাকার উপাসনা বলে না, প্রেমভক্তির ভরামাত্রা বলে। মনের আহুতির সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই আহুতি যোগ হইলে তবে ভগবানের কাছে মনুষ্যের আহুতি পূর্ণতা লাভ করে,নচেৎ মনুষ্যের ভক্তিও পূর্ণ হয় না, ঈশ্বরাহুতিও পূর্ণ হয় না। ভগ-বানকে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য মনুষ্যের মনও যেমন আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হইয়াছে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ও তেমনি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়ের সে আকাঙ্ক্ষা নাই তাহার ঈশ্বরপূজাও অসম্পূর্ণ ঈশ্বরাহুতিও অসম্পূর্ণ ঈশ্বরভক্তিও অসম্পূর্ণ। সে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় ধারা ।

কেতাব কীট।

গ্রন্থকর্ত্তা। দপ্তরি, এই পোকাগুলাকে মেরে ফেলত।

কে-কী। কেন বাপু, মার্ ধর্ করা কেন, পড়িতে আসিয়াছ পড়।

গ্র। আ গেল, এ পোকাটাত ভারি জেঠা দেখ্‌ছি।

কে-কী। সত্য কথা বলিলেই জেঠামি হয়!

গ্র। কীট-রত্ন! আপনিও কি কোন মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন নাকি? ক্ষুদ্র মানবের শিক্ষার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্।

কে-কী। বিদ্রুপ! ভালই। তাহাতে আমার কিছুই হইবে না, তুমি যে কেবল দম্ভ-সর্ব্বস্ব তাহাই প্রকাশ হইবে। অসার দাম্ভিক বই আর কেহ বিদ্রুপ করে না।

গ্র। যে আজ্ঞে! এখন মহাসত্যটা কি বলুন।

কে-কী। বলিব বই কি। ঠাট্টাই কর আর যাহাই কর, বলিব। বলি, পুস্তকাগারে পড়িতে আসিয়াছ পড়, মারপিট্ করা কেন? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে?

গ্র। আমাদের কত মারপিট্ করিতে দেখিয়াছ?

কে-কী। মারপিট্ ছাড়া তোমাদের কোন কাজইত দেখিতে পাই না। পাঁচ জনের অন্ন না মারিয়া তোমরা আপনারা অন্ন করিয়া খাইতে পার না। পাঁচ জনকে সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া তোমরা আপনারা ধনবান হইতে পার না। পাঁচজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অখ্যাতি না করিয়া তোমরা আপনারা খ্যাতি-

লাভ করিতে পার না। এমন কি, পরকে না মারিয়া তোমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেও পার না—

গ্র। সে কেমন কথা ?

কে-কী। তোমাদের সেই Vivisection-এর কথা। জীয়ন্ত পশুপক্ষীগুলাকে না মারিলে তোমাদের বিজ্ঞানের কলেবর বাড়ে না। পাঁচ জনকে না মারিলে তোমরা আপনারা জীবন রক্ষা করিতে পার না। এমনি তোমাদের ক্ষমতা, আর এমনি তোমাদের ধর্ম্ম! তোমাদের জাতিকে ধিক্! তোমাদের মানব নামে ধিক্।

গ্র। এখন দপ্তরি তবে তোকে ঠিক্ করে দিক্। দপ্তরি! এই পোকাগুলাকে মেরে ফেলত।

কে-কী। মরিতে ভয় করি না। তোমাদের জাতির ঢের শ্রাদ্ধ করেছি, এখন মরিলে দুঃখ নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে কি জন্য মারিবে ? আমাকে মারিলে তোমার অন্নও বৃদ্ধি হবে না, ঐশ্বর্য্যও বৃদ্ধি হবে না, যশও বৃদ্ধি হবে না, সুখও বৃদ্ধি হবে না। তবে আমাকে কি জন্য মারিবে ? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে ?

গ্র। তুই জানিস্ না, আমাদের কত লোকসান্ করিতেছিস্ ? এই সব বই কাটিয়া কাটিয়া তুই একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিস্, তোকে অবশ্য মারিব।

কে-কী। আমি মরিলেই কি তোমাদের বই আর নষ্ট হবে না ? তোমাদের সব বই অমর হবে ?

গ্র। হবে বৈকি। তোরা না কাটিলে বই আর কেমন করে নষ্ট হবে ?

কে-কী। গ্রন্থকারকুলভূষণ! গ্রন্থ কাহাকে বলে তাও জান না, পোকা কাহাকে বলে তাও জান না? এই দেখ দেখি— এই সেক্সপীয়র খানা, এই হোমরখানা, এই বাল্মীকিখানা, এই উপনিষদ খানা—এসব গুলাত কাটিয়া কুঁচি কুঁচি করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এসকল পুস্তকের কি কিছু করিতে পারিয়াছি? কিছু না। করিবার যো কি? এসব পুস্তক হয় মানব-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, নয় মানবাত্মার সুগভীর আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নয় উন্নত নর-নারীর প্রাণবায়ুস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, নয় সমাজ-শরীর নিয়ামক মহাশক্তি হইয়া উঠিয়াছে, নয় সামাজিক আচার ব্যবহার প্রথা প্রক্রিয়ারূপে বিকসিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এ সকল পুস্তক আর পুস্তকে নাই, এ সকল পুস্তক আত্মারূপ, হৃদয়রূপ, সমাজ-রূপ, শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। এ সকল পুস্তক আর পুস্তকাগারে থাকে না। এ সকল পুস্তক যদি পড়িতে হয় ত এস্থানে আসিও না। এ সকল পুস্তক এখন মানবজীবনে আছে, মানব-সমাজে আছে, মানব-শক্তিতে আছে, মানব-জগতে আছে। এ সকল পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা হয় ত এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া মানব-জগতে প্রবেশ কর। আমি, কেতাব-কীট, এ সকল পুস্তকের কি করিতে পারি! এ সকল পুস্তক আমি যতই কাটি না কেন, ইহাদের উচ্ছেদ অসম্ভব। ইহাদের এত কাটিয়া খাই তবু আমাদের পেট ভরে না, মনে হয় যেন পেটে কিছুই যায় নাই।

গ্র। সব বইই কি এই রকমের? তুমি ত সব বইই কাট।

কে-কী। আমি সব বইই কাটি। কিন্তু এই সব বইয়ের ন্যায় যে সব বইয়ের আত্মা আছে সে সব বই আমি কাটিলেও কাটা পড়ে না, নষ্ট হয় না। যে সব বই শুধু বই নয়, মানব-জাতির প্রকৃত বল, সে সব বইয়ের আমি, কেতাব-কীট, আমিও কাটিয়া কিছু করিতে পারি না, এবং তুমি, অসূয়ারূপী গ্রন্থকার, তুমিও নিন্দা করিয়া কিছু করিতে পার না। সে সব বইয়ের সম্বন্ধে তোমার ক্ষমতা দেখিতে যত বেশিই হউক প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষুদ্র কেতাব-কীটের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি নয়!

গ্র। আবার জেঠামি?

কে-কী। জেঠাদের কথা কইতে গেলেই জেঠামি হইয়া পড়ে, কি করিব বল। সে যা হউক। যে সব বইয়ের আত্মা নাই, সে সব বই কেবল বই মাত্র, মানবজাতির প্রকৃত বল নয়, স সব বই আমি কাটিলেও নষ্ট হয়, না কাটিলেও নষ্ট হয়। সে সব বই থাকা না থাকা সমান। সে সব বই নষ্ট হওয়াই ভাল। সে সব বই কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, হাঁকডাক বাড়ায়, মানুষকে আড়ম্বরে ভুলায়, সোজা পথকে বাঁকা করিয়া দেয়, শস্যের পরিবর্ত্তে খোসা খাইতে দেয়, জ্ঞানকে মত্ততায় বিলুপ্ত করে, সুস্থ আত্মাকে রোগগ্রস্ত করিয়া মারিয়া ফেলে। সে সব বই না থাকাই ভাল। তবে আর আমাকে মার কেন?

গ্র। আচ্ছা, তুমি যদিও আমাদের কোন অপকার কর না, কিন্তু তোমা হইতে আমাদের কোন উপকারও ত হয় না। তবে তোমাকে মারিব না কেন? তোমাকে রাখিয়া কি লাভ?

কে-কী। হাঁ, এটা ঠিক্ বটে। যাহা দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না, যেমন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মাতা,

তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাহাকে মারিয়া ফেলাই ভাল। যাহাকে লইয়া সুখ সম্ভোগ হয় না—যেমন নিঃসহায়া বৃদ্ধা কুটুম্বিনী বা নিরক্ষর উপার্জ্জনাক্ষম জ্ঞাতি-পুত্র—তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাহাকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হিন্দুর ছেলে হইয়া তোমরা যে রকম পাকা-পোক্ত জ্ঞানী হইয়াছ তাহাতে তোমাদের বাহাদুর বলিতে হয়। ফলতঃ এখন তোমাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্যই নাই—ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, উন্নতি বল, পরোপকার বল—কোন লক্ষ্যই নাই, এখন বাহাদুরী তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু, বাহাদুর সাহেব! আমি লোকের কিছু উপকারও করিয়া থাকি। শুনিবে কি?

গ্র। বল, কিন্তু অত impertinence talk করিও না।

কে-কী। বাপ্‌রে! তোমার কাছে কি আমি impertinence talk করিতে পারি? সে যে বড় স্পর্দ্ধার কাজ হবে। সে ভাবনা করিও না। এখন বলি শুন। তুমি ত একজন গ্রন্থকার। সকল গ্রন্থকারের ন্যায় তোমারও পড়াশুনা খুব কম কিন্তু পড়াশুনার ভাণ খুব বেশী। তুমি সেক্সপীয়রের নাটক ৩ খানা কি ৪ খানার বেশী পড় না, মিল্টনের ৩ সর্গের বেশী পড় না, বাল্মীকির রামায়ণের একটা শ্লোকও পড় না, কালিদাসের শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক বই আর কিছুই পড় না। কিন্তু এমনি ভাণ করিয়া থাক, যেন সেক্সপীয়র মিল্টন বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি সব দেশের সব গ্রন্থকারের সব রচনাই খাইয়া ফেলিয়াছ। এ গুমোরটুকু কেবল আমার প্রসাদাৎ করিতে পার কি না বল দেখি? আবার কখন কখন প্রকৃত বিদ্বন্মণ্ডলিকেও

যে Alcuin, Thomas Aquinas, Paracelsus প্রভৃতির কথা বলিয়া তাক্ লাগাইয়া দেও, সেও কেবল আমি, কেতাব কীট, আমার প্রসাদাৎ কি না বল দেখি? তবেই ত আমি, ক্ষুদ্র কেতাব কীট, আমিও তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া থাকি। আমার বাতাস একটু পাইলে তোমার ভাল হয় কি না বল দেখি?

গ্র। ঠিক বলেছ। তোমাকে কি মারিতে পারি! তুমি চিরকাল এই পুস্তকাগারে থাকিয়া পুস্তক কাট, আমি তোমায় কিছু বলিব না। কিন্তু এখন আমাকে Winckelmann-এর Troy সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে দুই চারিটা কথা বলিয়া দেও দেখি, আমি Gladstone-এর বর্জিল সম্বন্ধীয় মতটা খণ্ড খণ্ড করিয়া Plevna নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীতে একটা প্রকাণ্ড কীর্ত্তিপতাকা উড়াইয়া দি।

কে-কী। আঃ সে আর কোন্ কথা? এই বলিয়া দিতেছি লিখিয়া লও। দেখিতেছি, বই কাহাকে বলে এবং কেতাব কীট কাহাকে বলে তুমি যেমন বুঝিয়াছ তেমন আর কেহ বুঝে না। আহা! তুমি আমার শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিলে! তুমি বাহাদুরের গোষ্টিতে বাহাদুর! এখন যাও তুমি Gladstone-এর মাথা খাওগে—আমি তোমার গোষ্ঠীর মাথা খাইগে। দপ্তরি, ঐ বাঙ্গালা আল্মারিটায় আমাকে তুলিয়া দেও ত, দেখি, আমার উদরসাৎ হয়েও ওদের কয়জন বেঁচে থাকে। কেতাব-কীটকে চেনে না, আবার বই লিখ্‌তে চায়? হা কপাল!

[কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্—]

ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা।

কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম পারে উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান; বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান। উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই আঁবের যে গুণাগুণ বিচার হয়, তাহা বোধ হয় কেহ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উত্তরপাড়ায় একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটি উত্তম বাজার আছে, মিউনিসিপালিটি আছে। আর আছে—একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়। সভ্যতার উপকরণের মধ্যে নাই কেবল আদালত। কিন্তু না থাকিয়াও উত্তরপাড়ায় যেরূপ মামলা মোকদ্দমা, থাকিলে যে কি হইত, বলে কার সাধ্য?

মধ্যে একদিন উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম। দুই এক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আর তথাকার পুস্তকালয়টি দর্শন করিয়াছিলাম। পুস্তকালয়ে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও কাগজপত্র আছে। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে একখানি অপূর্ব্ব পুস্তিকা পাইলাম। পুস্তিকাখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা—নাম, সুধাবিন্দুসংগ্রহ। উহাতে তিনটি প্রবন্ধ দেখিলাম—একটি বর্গীর হাঙ্গামার কথা, একটি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের কথা, একটি ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা। শেষের কথাটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি তর্কপঞ্চাননের ত্রিবেণীর বাটীতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে দেশীয় রীতিতে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য একখানি কাষ্ঠাসন বা পীঁড়া প্রদান করিলেন। সাহেব কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন তর্কপঞ্চানন এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং এক টুকরা জলন্ত অঙ্গার সাহেবের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"সাহেব চুরট খাও, কিন্তু দেখিও যেন ধোঁয়া আমার গায় লাগে না।" সাহেব চুরট ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ধূমপান করিতে করিতে দুই জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন—দায়ভাগাদির কথাই বেশি। কোলব্রুক তখন দায়ভাগ অনুবাদ করিতেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় জগন্নাথের বাটীতে গিয়া দায়ভাগের কথাটাই বেশী কহিতেছিলেন।*

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তর্কপঞ্চানন সাহেবকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন! জলযোগের সামগ্রীর মধ্যে ফলের ভাগই বেশী—ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, আম, কাঁটাল, রম্ভা এবং বড় একবাটি দুগ্ধ। সাহেব দুগ্ধ বেশী খাইলেন না, রম্ভা যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা খাইয়া আরো গোটাকতক চাহিয়া লইয়া খাইলেন। রম্ভার কথায় তর্কপঞ্চানন দুই একটা পরিহাস করিলেন, সাহেব শুনিয়া খুব হাসিলেন।

জলযোগের পর আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, সাহেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু

* এ কথাটা পুস্তিকায় নাই, আমাদের অনুমান মাত্র।

সংস্কৃতে ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তর্ক-পঞ্চানন যেন বিস্মৃত ও চমকিত হইয়া বলিলেন—"সে কি সাহেব, ইতিহাস নাই কি?"

সাহেব। কই, ইতিহাস কি আছে?

তর্ক। কেন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি কি? ওগুলি কি ইতিহাস নয়?

সাহেব। ওগুলি ইতিহাস নয়। রামায়ণ মহাভারত কাব্য, পুরাণগুলি উপন্যাস।

তর্ক। হ'লই বা কাব্য, হ'লই বা উপন্যাস—কাব্য বা উপন্যাস হইলে কি ইতিহাস হইতে পারে না?

সা। কেমন করিয়া ইতিহাস হইতে পারে? ইতিহাসে কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে। পুরাণাদিতে তাহা নাই।

তর্ক। ধরিলাম, নাই—ধরিলাম, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ নাই। কিন্তু পুরাণাদি সে জন্য ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিবে না কেন? পুরাণাদিতে যে সকল রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতির বিবরণ আছে তাহা যদি প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে পুরাণাদি ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কিরূপ ফলাফল হয়, জাতিতে জাতিতে কি প্রকার সম্বন্ধ হইলে কি প্রকার ফলাফল হয়, রাজা কি প্রকারে রাজকার্য্য করিলে কি প্রকার ফলাফল হয়, ইত্যাদি মানবজীবনঘটিত ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য—প্রকৃত মানবজীবন, প্রকৃত মানবসমাজ ও প্রকৃত রাজকার্য্য দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। নির্ণয় করিয়া যদি কল্পিত ঘটনাদি

অবলম্বন করিয়াও তাহা বিবৃত করা হয়, তাহা হইলে সে বিবরণ মানবের ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? এই যে হিতোপদেশ গ্রন্থে এত নীতি কথা আছে। পশু পক্ষীর গল্পের ছলে সে সকল কথা লিখিত আছে বলিয়া হিতোপদেশ খানিকে নীতিগ্রন্থ না বলিয়া উপন্যাস বলিতে হইবে কি? ভগবান বেদব্যাসও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বহুলোকের জীবন, বহুবিধ মনুষ্যসমাজ ও নানা রাজ্যের রাজকার্য্য দেখিয়া মানবজীবন, সমাজ ও রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্য অবগত হইয়া, পুরাণে সেই সকলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ধরিলাম, কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য পুরাণগুলি ইতিহাস না হইয়া উপন্যাস বা উপকথা হইবে কেন? এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যে বলিলে, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার কথা নাই। তুমি কেমন করিয়া জানিলে, নাই? রামরাবণের যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের কথা, হরিশচন্দ্রের কথা,—এসব যে উপকথা বা অলীক কথা, কেমন করিয়া জানিলে?

সা। আচ্ছা, এই রামায়ণের যুদ্ধের কথাটা ধর। রাম বানর ভল্লূকের সাহায্যে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়?

তর্ক। কেন, সাহেব, কলিকাতায় তোমাদের জাহাজের যে সব গোরা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে বানর বলিলে কি বড় একটা মিথ্যা বলা হয়?

সা। (হাসিয়া) না, তা হয় না, সত্য। বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহারা বানরবৎই বটে।

তর্ক। কিন্তু তাহাদের সাহায্যেইত তোমরা জাহাজে চড়িয়া মহাসাগর পার হইয়া আসিতেছ। তবে আর বানরের সাহায্যে একটা রাজাকে পরাজয় করা এমন কি অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা ?

সা। সে যাহা হউক, কিন্তু পুরাণাদিতে ত প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই, তবে—

তর্ক। আবার ঐ কথা ? কেমন করিয়া জানিলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই—প্রমাণ কই ?

সা। আচ্ছা, ও কথাটা ছাড়িয়া দিন। পুরাণাদি যে ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাত অস্বীকার করিতে পারেন না।

তর্ক। কেন, ইতিহাসের লক্ষণ কি ?

সা। ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ এই যে উহাতে অলীক বা কাল্পনিক কথা থাকে না, কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে।

তর্ক। এইত ও কথা ছাড়িয়া দিলে, আবার তুলিতেছ কেন ?

সা। তুলিতেছি তাহার কারণ এই যে, ইতিহাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অগ্রে ঐ লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

তর্ক। কিন্তু বুঝিলে ত যে ও লক্ষণ পুরাণাদিতে নাই এমন নয়।

সা। তা বটে, কিন্তু একটা কথা আছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হইলেই যে ইতিহাস হয়, তাহা নয়। ইতিহাসের বর্ণনার একটি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণের অভাবেও ইতিহাসের অভাব হয়।

তর্ক। সে লক্ষণটি কি ?

সা। সকল জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তর্ক। সে কেমন ?

সা। একটি উদাহরণ দিয়া না বুঝাইলে সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

তর্ক। উদাহরণ দিয়াই বুঝাও।

সা। এই রামায়ণের কথাই ধরুণ। রামায়ণ—রাজা রামচন্দ্রের কথা। কোন লোকের কথা কহিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার জন্মস্থানের পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ কিছুই লিখিত নাই। উহা যে দেশে অবস্থিত তাহার চৌহদ্দী লিখিত নাই, যে জেলায় অবস্থিত তাহার নাম কি চৌহদ্দী কিছুই লিখিত নাই, উহার ল্যাটিটুড্ লঞ্জিটুড্ লিখিত নাই, রামের জন্মের পূর্ব্বে উহা কখন্ কোন্ নামে খ্যাত ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কথার কোন কথাই লিখিত নাই। তবে কেমন করিয়া বলি যে রামায়ণ ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত ?

তর্ক। আচ্ছা, আরো একটু বল, লাগ্‌ছে ভাল।

সা। রামায়ণে রামের জন্মের কোন বর্ণনা নাই বলিলেই হয়। রামায়ণ যদি ইতিহাস হইত, তাহা হইলে উহাতে রামের জন্মের এই রকম একটা বিবরণ থাকিত—অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ দিবসে বেলা ৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হয়। কোন কোন ইতিহাসে বলে, ১৯ সেকেণ্ডের সময় নয়, ১৯½ সেকেণ্ডের সময়। কিন্তু অপর সমস্ত কাজ ফেলিয়া, এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এক রকম ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর খাস সেরেস্তায় ক্রমাগত সাড়ে

চারি বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে রামের জন্ম ১৯½ সেকেণ্ডের সময় হয় নাই, ঠিক ১৯ সেকেণ্ডের সময় হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন ১৯½ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রম করিয়াছেন এবং ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহারা আর একটি বিষম ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সূতিকাগারে রামের জন্ম হয়, তাহা ৭ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ ও ৫ হাত উচ্চ। আমরা কিন্তু এবিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করা অতিশয় প্রয়োজনীয় জানিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি। যে ঘরামি সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল রাজবাটির হিসাব সেরেস্তায় তাহার নাম ধাম জানিয়া লইয়া আমরা প্রথমে অযোধ্যায় ঘরামি পল্লীতে তাহার অনুসন্ধান করি। দশ পনর দিন অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম যে সে ঘরামি অযোধ্যাবাসী নয়, সে রামের জন্মের কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া ঐ সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আবার স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিল। এরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা দুই তিন মাসের পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলাম। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘরামির গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঘরামিকে সূতিকাগারের দৈর্ঘ্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিতে পারিল না, বলিল—আমার মনে নাই। তখন ভাবিলাম, এত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান বৃথা হইতেছে। সেটা কিন্তু ভাল নয়। এ রকম অনুসন্ধান বৃথা হইলে কাহারো ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে ইতিহাসের

সমূহ ক্ষতি হইবে। অতএব সূতিকাগারের পূর্ব্ব বর্ণনা ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেই হইতেছে। ভ্রান্ত যে নয়, তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? অযোধ্যার পাটরাণীর সূতিকাগার দৈর্ঘ্যে ৭ হাত, প্রস্থে ৪ হাত ও উর্দ্ধে ৫ হাত বই নয়, এমন কি হইতে পারে? সূতিকাগার নিশ্চয়ই দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত, প্রস্থে ৪০ হাত এবং উর্দ্ধে ৫০০ হাত।

রাম ভূমিষ্ঠ হইলে পর কৌশল্যার প্রধানা পরিচারিকা রাধী খাস দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে শুভ সম্বাদ জ্ঞাপন করিল। তখন বেলা ১০ ঘণ্টা ১১ মিনিট ২২ সেকেণ্ড।

তখন খাস দরবারে প্রধান মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, ৭ জন সভাসদ, ৬ জন চোপদার, ৪ জন খানসামা, ২ জন গুপ্তচর, ২ জন পত্র-লেখক, ৪ জন পত্রবাহক এবং ১২ জন প্রহরী উপস্থিত ছিল। সম্বাদ পাইবা মাত্র রাজা পুত্র দর্শনার্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। 'সিংহাসন স্বর্ণনির্ম্মিত দেড় কোটী আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের মণিমুক্তা খচিত এবং ওজনে ১ মণ, ৩৫ সের ৩ পোয়া ২৮০ ছটাক। সিংহাসন হইতে নামিয়া তিনি প্রধানা-মাত্য, সভাসদগণ, ২ জন খানসামা ও ৪ জন প্রহরীকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুমতি করিলেন এবং আপন কণ্ঠহার খুলিয়া রাধীকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সে কণ্ঠহারের মূল্য ৭৫ লক্ষ ১১ হাজার ৫১৭½ স্বর্ণমুদ্রা। রাজা দশরথ তখন আহ্লাদে এতই বিহ্বল যে বাঁ পায়ের জুতা ডান পায়ে এবং ডান পায়ের জুতা বাঁ পায়ে দিয়াই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই অত্যাবশ্যক কথাটি অন্য কোন ইতিহাসে লিখিত হয় নাই।

এবং সেই জন্য সে সকল ইতিহাস এক কালে অসার, অপদার্থ ও গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া এই মহামূল্য কথাটি অবগত হইয়া ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

রাজা সূতিকাগারের দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র পুরবাসিনীরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। তখন প্রধানা ধাত্রী নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। প্রধানা ধাত্রীর নাম যোশি, তাহার বয়স ৬৩ বৎসর ৭ মাস ১২½ দিন। সে গৌরবর্ণা ও কৃশাঙ্গী। তাহার বাম হস্তে ৬টি অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখটি খুব বড়। রাজার সম্মুখে আনিবামাত্র শিশু একবার হাঁচিয়া ফেলিল। সকলে 'দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ু' বলিয়া উঠিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া কোষাধ্যক্ষ শিশুকে যৌতুক ও ধাত্রীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা বহির্বাটীতে গমন করিবেন বলিয়া ফিরিলেন। কিন্তু তখনও তিনি আহ্লাদে এত আত্মহারা যে কৌশল্যার মহল দিয়া না আসিয়া কৈকেয়ীর মহল দিয়া আসিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে যখন কৈকেয়ীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ একজন পরিচারিকা কৈকেয়ীর গৃহাভ্যন্তর হইতে এক কুলা ছাই গৃহের বাহিরে ফেলিয়া দিল। ছাই উড়িয়া রাজার চক্ষে পড়িল। 'আঁখ্ গিয়া, আঁখ্ গিয়া' বলিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন। প্রহরিরা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কৈকেয়ীর পক্ষের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে সেই অবধি রাজা অন্ধ হন। কিন্তু আমরা জানি, তা নয়—তাঁহারা ঘোর মিথ্যা কথা

কহিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধানের ফল এই ইতিহাসের যথা স্থানে প্রকাশ করিব। তাহার পর—

তর্ক। আর বলিতে হইবে না। এই রকম করিয়া লিখিলেই ইতিহাস হয়?

সা। হাঁ।

তর্ক। বাল্মীকি যদি এই রকম করিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ ইতিহাস আখ্যা পাইত?

সা। পাইত বই কি।

তর্ক। আচ্ছা, এরকম ইতিহাস তোমাদের কত আছে?

সা। সহস্র সহস্র—সংখ্যা হয় না।

তর্ক। তোমাদের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থের আদর কেমন?

সা। খুব—এমন কি, আমাদের মধ্যে যে যত ইতিহাস পাঠ করে সে তত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়।

তর্ক। তোমাদের টোলেও কি ঐ রকম ইতিহাস বেশী পঠিত হয়?

সা। আমাদের টোল নাই, স্কুল, কালেজ ও ইউনিবর্সিটি আছে। তথায় বালকদিগকে রাশি রাশি ইতিহাস পড়িতে হয়, নহিলে তাহাদিগের শিক্ষা নিতান্তই অঙ্গহীন হয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

তর্ক। সাহেব তোমাদের ইতিহাস আর তোমাদের শিক্ষা লইয়া তোমরা থাক, আমাদের উপকথাই ভাল। এখন এস অন্য কথা কই।

জীবনের কথা।

ইংরাজী সাহিত্যে যে প্রকার গ্রন্থকে জীবনচরিত বলে সংস্কৃত সাহিত্যে সে প্রকার গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। শঙ্কর বিজয় প্রভৃতি যে দুই একখানি আছে তাহা ইংরাজী জীবন-চরিতের প্রণালীতে লিখিত নয়। কিন্তু সংস্কৃতে প্রকৃত জীবন-চরিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ইউরোপে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় জীবনচরিতেরও বড় বাড়া-বাড়ি হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে তথায় এমন লোক নাই যাহার জীবনচরিত লেখা হয় না। আর সেই সকল জীবনচরিতে কত কথাই থাকে তাহার ঠিকানা নাই। খাইবার কথা, শুইবার কথা, বেড়াইবার কথা, হাই তুলিবার কথা ইত্যাদি শত সহস্র কথা থাকে। সে সকল কথা জানিয়া কাহারও কিছু মাত্র উপকার নাই। অথচ সেই রকম কথাতেই সেই সকল জীবনচরিত প্রায় পরিপূর্ণ থাকে। অতএব জীবনচরিতের সংখ্যা খুব কম হওয়া উচিত। যে সে ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা উচিত নয়। লোকশিক্ষার্থ জীবনচরিত লিখিতে হইলে পৃথিবীতে বোধ হয় বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ ষাট খানা জীবনচরিতের বেশী লেখা আবশ্যক হয় না। একই শিক্ষা কতক গুলা পুস্তকে দিবার প্রয়োজন কি? ইউরোপে যে সকল জীবনচরিত লিখিত হয় তাহার অধিকাংশেই বিশেষ কোন শিক্ষা থাকে না, আর অনেক গুলাতে প্রায় একই রকম শিক্ষা থাকে। ইউরোপে এখন লিখিবার (এবং পড়িবারও) একটু বেয়াড়া রকম নেশা চলিতেছে

বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় জীবনচরিতও রাশি রাশি লেখা হইতেছে। আবশ্যক অনাবশ্যক বিবেচনা নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, কেবলই লেখা হইতেছে এবং পড়া হইতেছে।

ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যদি জীবন-চরিত লেখা হয় তাহা হইলে জীবনচরিত লিখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। মৃত্যুর পরেও থাকে কোনও লোকের জীবনে এমন কিছু থাকিলে সে লোকের জীবনচরিত না লিখিলেও তাহা থাকিবে। মানুষের প্রাচীন গুরুদিগের জীবনচরিত কেহ কখন লিখে নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন। মৃত্যুর পর যাহা থাকিবার নয় জীবনচরিতে লিখিলেও তাহা থাকে না। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখিত হইবার পূর্ব্বেও লোকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিত এখনও তাহাই জানে। কাল যাহা ডুবায় তাহা ডুবিবার জিনিস, মানুষ সহস্র চেষ্টায় তাহা ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। তাহা ডুবিয়া যাওয়াই উচিত। কালের ন্যায় সুন্দর চমৎকার বিচক্ষণ জীবনচরিত-লেখক আর নাই। অধ্যাপক ম্যাসন মিল্টনের সুদীর্ঘ জীবনী লিখিয়াছেন। তাহাতে মিল্টন সম্বন্ধে কত কথাই লেখা হইয়াছে। কিন্তু মিল্টন সম্বন্ধে যাহা জানিবার লোকে তাহা অগ্রেই জানিয়া লইয়াছে। ম্যাসনকৃত জীবনী পড়িয়া অধিক কিছু জানিতে চায় না। এইরূপই হইয়া থাকে এবং হওয়াই উচিত।

এখন কথা হইতেছে, কোন লোক সম্বন্ধে যাহা থাকা উচিত তাহা কি প্রকারে থাকিলে ভাল হয়। ইউরোপ জীবনচরিত

লিখিয়া তাহা রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে জীবনচরিতে এত অনাবশ্যক কথা থাকে যে সে সমস্ত পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় কথাটি জানিবার প্রবৃত্তি অতি অল্প লোকেরই হইতে পারে। অতএব যদি জীবনচরিত লিখিয়া প্রয়োজনীয় কথা রাখিয়া দিতেই হয় তবে জীবনচরিত লিখিবার প্রণালী আমূল সংশোধন করা উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিত অপরে লিখিলে তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত অপেক্ষা দশ পনর গুণ বড় একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়িত। সংস্কৃত সাহিত্যে জীবনচরিত নাই, কিন্তু জীবনচরিতে যাহা থাকা উচিত বোধ হয় তাহা না আছে এমন নয়। পুরাণাদিতে অনেক লোকের গল্প আছে। কাহারও গুরুভক্তির গল্প, কাহারও মাতৃভক্তির গল্প, কাহারও সত্যনিষ্ঠার গল্প, কাহারও দানধর্ম্মের গল্প, কাহারও আত্মসংযমের গল্প, কাহারও আশ্রিতপালনের গল্প, এইরূপ নানা লোকের নানা গল্প আছে। আমার বোধ হয় যে সে সকল গল্প একেবারে অলীক বা কাল্পনিক নয়। সে সকল গল্প কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস বা জীবনচরিত। ব্যক্তি বিশেষের যশ ঘোষণা করা বা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সে জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যশোলাভের প্রয়াস নাই। এই গ্রন্থ খানা আমার লেখা, ঐ গ্রন্থখানা অমুকের গ্রন্থ হইতে চুরি করা, নাম বাজাইবার জন্য এরূপ গণ্ডগোল সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। সে সাহিত্যে কত গ্রন্থকারের নাম পাওয়াই যায় না। এক ব্যাস নামের ভিতর কত গ্রন্থকার আপনাদের নাম ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অতি মহাপুরুষ ছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সেবা করিয়াই তাঁহাদের

পরিতৃপ্তি হইত। আপনাদিগকে প্রখ্যাত করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের মনে উদয় হইত না। সেই জন্য তাঁহাদের রচিত পুরাণাদিতে যে সকল জীবনচরিত বা ইতিহাস দৃষ্ট হয় তাহা ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত বা ইতিহাসরূপে দৃষ্ট হয় না। ব্যক্তিবিশেষ তাহাতে বিস্মৃত বা বিলুপ্ত। ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তিই তাহাতে ধর্ম্মকাহিনীরূপে রক্ষিত ও বিবৃত। মানুষের এইরূপ কীর্ত্তিকাহিনীই তাহার প্রকৃত জীবনচরিত বা ইতিহাস। এই জন্যই পুরাণাদিকে আমাদের শাস্ত্রে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রণালীতে জীবনচরিত লেখা অতি উত্তম। এই প্রণালীর জীবনচরিতে বাজে কথা থাকিতে পারে না এবং যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাবশ্যক কথায় ইউরোপীয় জীবনচরিত পরিপূর্ণ থাকে তাহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এ রকম জীবনচরিতে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কথা জাতীয় জীবনের কথার অংশ হইয়া পড়ে, ব্যক্তিবিশেষের বিশেষত্ব জাতীয় বিশেষত্বে বিলীন হইয়া যায়। অতএব এ প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিলে ইউরোপীয় প্রণালীর জীবনচরিতে লোক মধ্যে যে অহঙ্কার আত্মগরিমা ও আত্মাভিমানের প্রশ্রয় হইয়া থাকে তাহার উন্মেষ বা আবির্ভাব একেবারেই অসম্ভব হয়। সে বড় সামান্য লাভ নয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রণালীর জীবনচরিত লিখিত না হইয়া প্রকৃত হিন্দু প্রণালীর জীবনচরিত লিখিত হয় ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। আমরা এখনও মানুষ হই নাই। আমাদের মানুষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। মানুষ না হইলে জীবনচরিতও হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যে দুই চারি

জন নরনারী মানুষ হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের জীবনচরিত্র লিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এখন কালের হাতেই থাকুন। পরে যখন আমরা মানুষ হইব এবং আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, নীতি ও ধর্ম্ম একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট সুমহান্ পথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে তখনও যদি তাঁহাদের কিছু থাকে তবে সেই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও এক পুরাণ বা বাঙ্গালী জাতির জাতীয় জীবনের এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া সেই অপূর্ব্ব পুরাণে বা ইতিহাসে তাঁহাদের জীবনের কথা মিশাইয়া দেওয়া যাইবে। সে পুরাণে বা ইতিহাসে যদি তাঁহাদের জীবনের কথা মিশাইয়া দিতে পারা যায় তবে ইউরোপীয় প্রণালীতে তাঁহাদের জীবনচরিত এখন লিখিত না হইলেও সে কথা সে পুরাণে বা ইতিহাসে মিশাইয়া দিতে পারা যাইবে। আর যদি তখন সে পুরাণে বা ইতিহাসে সে কথা মিশাইয়া দিতে পারা না যায় অথবা মিশাইয়া দিবার উপযোগী না থাকে তবে এখন ইউরোপীয় প্রণালীতে তাঁহাদের শত শত জীবনচরিত লিখিত হইলেও সে কথা সে পুরাণে বা ইতিহাসে মিশিবে না। বাঙ্গালীর জীবনচরিত এখন লিখিয়া কাজ নাই। একবার ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের স্বর্গীয়া সাবিত্রী রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর একখানি জীবনচরিত লিখিব বা লেখাইব। কিন্তু এখন মনে করিতেছি যে তাহা করিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালী যদি মানুষ হয় তবে ব্যাসরচিত পুবাণের ন্যায় বাঙ্গালীর রচিত পুরাণেও এক সাবিত্রীর কথা থাকিবে। কাল ভাল জিনিস নষ্ট করে না।

তৃতীয় ধারা ।

সিদ্ধিদাতা গণেশ।

১

উদ্ধব ঘোষ চাষ করিয়া খায়। প্রত্যহ প্রত্যুষে হল কাঁধে করিয়া এক যোড়া হেলে গরু লইয়া ক্ষেতে যায়। যাইবার সময় একবার তারাচাঁদ সরকার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যায়। সরকার মহাশয় প্রাতে আপন বহির্বাটীর বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু সেবা করেন। উদ্ধব দূর হইতে তাঁহাকে একটি নমস্কার করিয়া মাঠে যায়। উদ্ধবের বিশ্বাস যে, প্রাতে সরকার মহাশয়কে দেখিয়া ক্ষেতে গেলে চাষে ফল ভাল হয়।

২

অলকাসুন্দরী আজ ছয় বৎসরের পর হাসিতেছে। পতিব্রতার পতি ছয় বৎসর গৃহে ছিল না। কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসে ছিল। যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিয়া পতি আজ বাড়ীতে আসিয়াছে। আহ্লাদের কাঁদাকাটার পর অলকাসুন্দরী পতিকে হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি আজ আসিবে তা আমি জানি। পতি জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করিয়া জানিলে? আমি ত পত্র লিখি নাই। পতিব্রতা উত্তর করিল—আজ সকালে ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে কমল পিসীর মুখ দেখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র মনে হইয়াছিল, আমার ছয় বৎসরের দুঃখ আজ ঘুচিবে।

৩

ইত্যাদি।

এইরূপ এদেশে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে, কাহারো কাহারো মুখ দেখিয়া দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিলে

সে দিবসটাই সুখে কাটে এবং সে দিবসের কার্য্যও সফল হয়। এ বিশ্বাস যুক্তিমূলক কি না, এস্থলে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এখানে একটি কথার উল্লেখ করিলেই চলিবে। যাহাদের দর্শন লোকে সুফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে ধীর ও শান্তস্বভাব বিশিষ্ট দেখা যায়। অন্তত এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহাদিগকে দেখা লোকে মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহাদের আকারে উগ্রতা, ঔদ্ধত্য বা চপলতা লক্ষিত হয় না। ধীরতা, সংযম ও শান্তি যাহার মূর্ত্তিতে ব্যক্ত, সে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, লোকে কেবল তাহারই দর্শনের সহিত সিদ্ধির প্রত্যাশা সংযুক্ত করিয়া থাকে।

লোকের যেরূপ বিশ্বাস, পৌরাণিক পণ্ডিতের শিক্ষাও সেই রূপ। সে শিক্ষা সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট। গণেশ-মূর্ত্তি চঞ্চলতা, চপলতা, উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, ব্যগ্রতা, হঠকারিতা বা অস্থিরতার মূর্ত্তি নয়। সে মূর্ত্তি স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সংযম, সতর্কতা ও চিন্তাশীলতার মূর্ত্তি। গণেশকে দেখিলে চালাক চট্‌পটে বা ব্যস্তত্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। আজ কাল লোকে সচরাচর যে সকল গুণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক মনে করে, গণেশমূর্ত্তিতে সে সকল গুণ ব্যক্ত নয়। আজিকার ইউরোপে এবং ইউরোপের দেখাদেখি আজিকার নব্য বঙ্গে লোকের এই-রূপ ধারণা যে, হুটাপুটি লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি চালাকি ব্যতীত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কিন্তু সে রকম কোনও ভাবই গণেশের মূর্ত্তিতে লক্ষিত হয় না। গণেশের মূর্ত্তিতে সেরকম ভাবের বিপরীত ভাবই অভিব্যক্ত। এখন কথা হইতেছে—গণেশ সত্য না মিথ্যা। কার্য্যসিদ্ধির জন্য

ব্যস্ততা চঞ্চলতা প্রভৃতি গুণ আবশ্যক, না ধীরতা গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণ আবশ্যক ? এ কথার সম্যক উত্তর এই যে, দুই ই আবশ্যক ; কিন্তু ধীরতা সংযম গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণই বেশী আবশ্যক। কোনও কার্য্য করিতে হইলে অনেক দিক, অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক সুবিধা অসুবিধা, অনেক অগ্রপশ্চাৎ, অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, অনেক ওজরআপত্তি, ইত্যাদি উত্তমরূপে ধীরভাবে সাবধানে সুগভীর প্রণালীতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এই প্রকারে সকল রকম বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়, কার্য্য করা উচিত কি না। শুদ্ধ একটা ক্ষণিক মানসিক আবেগে কার্য্য আরম্ভ করা অকর্ত্তব্য। সকল দিক বিবেচনা না করিয়া, কেবল ভাব বা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা একটা মতের খাতিরে কার্য্য করিলে ফল প্রায়ই শোচনীয় হয়। আবার কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যের অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্য করিতে করিতে সে সকল বাধাবিঘ্নও ধীর ও গভীর ভাবে বুঝিয়া দেখিতে হয়। নহিলে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিচার বিবেচনা ও মন্ত্রণা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। সে বিচার বিবেচনা বা মন্ত্রণায় ত্রুটি হইলে অপরিমিত উৎসাহ উদ্যম ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি থাকিলেও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। একটি উদাহরণ দি। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যম উগ্রতা চঞ্চলতা প্রভৃতি গুণ কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি তত হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রণস্থলেও প্রথমোক্ত গুণগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত গুণগুলি জয় লাভের জন্য বেশী আবশ্যক। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিং-

টনের উদ্যম, উগ্রতা ও উৎসাহ নেপোলিয়নের অপেক্ষা কম ছিল। নেপোলিয়নের ধৈর্য্য ও চিত্তস্থৈর্য্য ওয়েলিংটনের অপেক্ষা কম ছিল। অসংখ্য ইংরাজ সেনার বিনাশ দেখিয়াও ওয়েলিংটন ব্লুকরের আগমন পর্য্যন্ত স্থির ধীর অবিচলিত ভাবে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন দূরে তোপধ্বনি হইতে শুনিয়া চিত্তস্থৈর্য্য হারাইয়া আপন পক্ষের সেনানায়ক মার্শল গ্রুজে আসিতেছে ভাবিয়া বীর বিক্রমে আপন সেনা রণস্থলে পরিচালনা করিয়া শীঘ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন। কার্য্যের মহা উদ্যম উৎসাহ ও ব্যস্ততার ভিতরেও অবিচলিত বুদ্ধি, স্থির চিত্ত, সম্পূর্ণ আত্মসংযম এবং গভীর চিন্তাশীলতা আবশ্যক। নহিলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই জন্যই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি উগ্রতা চঞ্চলতা বা ব্যস্ততাব্যঞ্জক নয়, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সংযম শান্তি গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। কার্য্যসিদ্ধির হিসাবে গণেশমূর্ত্তিই প্রকৃত মূর্ত্তি—গণেশমূর্ত্তিই প্রকৃত সত্য।

আজিকার দিনে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সকল সময়েই মানুষের এই সত্যটি স্মরণ করা আবশ্যক, কেন না মানুষ সকল সময়েই কেবল মাত্র মানসিক আবেগের বা অশুদ্ধ সংস্কারের স্বল্পাধিক বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল আমরা কিছু বেশী আবেগবান ও হঠকারী হইয়া, সকল দিক না দেখিয়া না বুঝিয়া, কার্য্য করিয়া থাকি। কালেজ ছাড়িয়াই আমরা পালে পালে আদালতে ওকালতি করিতে যাই। ওকালতি করিতে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা আছে কি না, ওকালতি করিতে যে অর্থ বা সহায়তা আবশ্যক তাহা আয়ত্তাধীন কি না,

ইত্যাদি নানা কথার মধ্যে কোনও কথাই বিবেচনা না করিয়া আমরা দলে দলে উকিল হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা দলে দলে ডাক্তার হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে চাকুরির উমেদার হই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা পালে পালে মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় লইয়া গ্রন্থকার হইয়া উঠি। ইংরাজি শিখিয়া আমরা আমাদের দেশের সকল জিনিসই ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাই কোনও দিক না দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই না বুঝিয়া এক একটা ভাবের বা অপরিপক্ক সংস্কারের তাড়নায় আমরা উন্মত্তের ন্যায় গৃহসংস্কার, সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি আকাশ পাতাল সংস্কার করিতে যাই। কোনও সংস্কারই করিতে পারি না। বরং একটা দোষ সংস্কার করিতে গিয়া দশটা দোষ সৃষ্টি করিয়া বসি। রোগীর রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা আধ মিনিটের মধ্যে রোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া এমনি ঔষধাদি ব্যবস্থা করি যে আধ ঘন্টার মধ্যেই স্বয়ং রোগীরও শেষ হইয়া যায়। এইরূপ সকল কার্য্যেই আমরা মনে করি যে, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি লম্ফ ঝম্প করিলেই খুব কাজ করা হয়। তাই যেমন আমাদের মনে একটা খেয়াল উঠে অমনি আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে যাই। তাই আমরা কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারি না।

অতএব এই হঠকারিতা ও আবেগানুবর্ত্তিতার দিনে সিদ্ধি-দাতা গণেশের কথা স্মরণ করা বড় আবশ্যক। গণেশের সেই স্থির ধীর গম্ভীর শান্ত সংযত চিন্তাশীল মূর্ত্তি চিত্তে অঙ্কিত করিয়া সকল কার্য্য স্থির ধীর গম্ভীর শান্ত সংযত ও চিন্তাশীল প্রণালীতে

না করিলে আমাদের বিশৃঙ্খলতা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা ঘরে বাহিরে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনার ভাগী হইব। অতএব আমাদের সকলেরই ভক্তিভাবে সেই সিদ্ধিদাতা গণেশমূর্ত্তি চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। গণেশ মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-পতিরই এক বিস্ময়কর মূর্ত্তি। জলে স্থলে মহাশূন্যে যখন তুমুল ঝটিকা বহিতে থাকে—আকাশে বজ্রের ঝন্‌ঝনা, জলে তরঙ্গ গর্জ্জন, জলে স্থলে আকাশে পঞ্চভূতের প্রলয়াস্ফালন—তখনও জল স্থল বায়ু বহ্নি ব্যোম সকলেরই সকল নিয়মগুলি সম্পূর্ণ সূক্ষ্মতম প্রণালীতে প্রতিপালিত হয়, কাহারো কোন নিয়মের কণামাত্রও ব্যর্থ বা বিপর্য্যস্ত হয় না। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডপতির বিস্ময়কর গণেশমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বিশ্বপটের অন্তরালে যাইতে হয়। কার্য্যসিদ্ধির কারণ বুঝিতে হইলেও কার্য্যক্ষেত্রের অন্তরালে ঢুকিতে হয়।

বাঙ্গালির প্রকৃত কাজ।

মুকুন্দ ঘোষ খুব বড় ঘরের ছেলে। বহুপূর্ব্বে তাহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা খুব মান্য গন্য ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী ছিল। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত পুরুষ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তালুক মুলুক যাহা ছিল সব গিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌বাগিচা নাখেরাজ জোত জমাও বিক্রয় হইয়াছে। ভদ্রাসনটুকুও কয়েক বৎসর নাই। মুকুন্দেরা একখানি ছোট খড়ো ঘরে থাকে। সে ঘরের চালেও আবার খড় নাই। চালখানা স্থানে স্থানে শুকনা পাতা ঢাকা। মুকুন্দের মা ভাই বোন প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি পরিবার। তাহাদের দুবেলা অন্ন জুটে না। প্রায়ই ভিক্ষার উপর নির্ভর। কাহারো পরিধানের রীতিমত বস্ত্র নাই, সকলেই ছেঁড়া নেকড়া কোন রকমে গুছাইয়া পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে। ১০।১২ বৎসরের ভাই দুটো ত ন্যাংটোই বেড়াইয়া বেড়ায়। মাসে দুই চারি আনা পয়সা হইলে তাহারা গ্রামস্থ পাঠশালায় দুই অক্ষর শিখিতে পারে, তাহাও জুটে না, দিবারাত্রি হো হো করিয়াই বেড়ায়। মুকুন্দের এক বৎসরের একটি ছোট ভাই দুধ খেতে পায় না। যৎসামান্য স্তন্যপান করিয়া পেটের জ্বালায় দিবা-রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটায়। এইত গেল মুকুন্দের ঘরের অবস্থা, কিন্তু মুকুন্দ কলিকাতায় উন্নতি-বিধায়িনী সভার সভ্য হইয়া কেবল বড় বড় বক্তৃতা করে।

ব্রিটিশ পার্লেমেন্টে বাঙ্গালি মেম্বর হওয়াও কি ঠিক্ সেইরূপ নয়? বাঙ্গালি জাতি অতি অধম, অতি দরিদ্র, অতি অসার।

বাঙ্গালির ঘরে অন্ন নাই। যা এক আধ মুঠা আছে তাহা কেবল পরে অনুগ্রহ করিয়া লয় না বলিয়া আছে, নতুবা তাহাও থাকিবার কথা নয়। বাঙ্গালির পরিধানের বস্ত্র নাই। যতক্ষণ না পরে একখানি বস্ত্র আনিয়া দিবে ততক্ষণ লজ্জা রক্ষা হওয়া ভার। একদিন বাঙ্গালি সমস্ত জগতকে কাপড় পরাইয়াছে। আজ বাঙ্গালি এতটুকু সূতার জন্যও পরের মুখাপেক্ষী। বাঙ্গালির বিদ্যা নাই, বাঙ্গালি মূর্খ। বাঙ্গালির সাহিত্য সবে সুরু হইয়াছে। সে সাহিত্যের শক্তি নাই, বিস্তার নাই, প্রকৃত সারবত্তা নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, তেজ নাই, প্রতাপ নাই, মহিমা নাই। বাঙ্গালির দেহ দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। বাঙ্গালির শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয় বাঙ্গালির তাহা নাই; যাহা থাকিলে জাতি জাতি হয়, বাঙ্গালি জাতির তাহা নাই। তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়? বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি মানুষ নয় ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিলে বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি জাতি জাতি নয় বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়? গরিবের ছেলে মুকুন্দের উন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্য হওয়াও যা বাঙ্গালির ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়াও কি তাই নয়? ঘরে এত কাজ থাকিতে, আপনাকে মানুষ করিবার এত বাকি থাকিতে, আপনাদিগকে জাতি করিয়া তুলিবার এত বাকি থাকিতে, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া কেন? মানুষকে মানুষ করিতে কত শক্তি, কত সামর্থ্য,

কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত একাগ্রতা, কত স্থিরলক্ষ্য লাগে বল দেখি? এত শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও মানুষকে মানুষ করিতে কত পুরুষ লাগে বল দেখি? আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কি এতই বাহুল্য হইয়াছে যে আমাদের ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজের জন্য এত উদ্বৃত্ত থাকে? তবে কেন ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের মেম্বর হওয়া বল দেখি? ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের মেম্বর হইতেও কিছু শক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু যখন আমরা এখনও মানুষই হই নাই, জাতিই হই নাই, তখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের মেম্বর হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ? আমরা মানুষ হই নাই, ইহা না বুঝিবার দরুনই আমরা ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের মেম্বর হইতে চাই। আমাদের ঘরের অবস্থা কি শোচনীয়, আমাদের মানুষ হইতে কতই বাকি, ইহাও আমরা বুঝি নাই--ইহা কি বিষম কথা! বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের মেম্বর হইতে যাওয়াতেই ত এই বিষম কথাটা এত বিকট ভাবে মনে উদয় হইল।

ব্রিটিশ পার্লেমেন্ট ইংরাজ জাতির জাতিত্বের অভিব্যক্তি। যে সকল শক্তির গুণে ইংরাজ ইংরাজ, যে সকল শক্তি সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সহস্র রকমে ইংরাজকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আজিকার ব্রিটিশ পার্লেমেন্ট সেই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি বা অধিষ্ঠানস্থল। সে শক্তি বাঙ্গালিতে নাই, বাঙ্গালি সে শক্তিতে গঠিত হয় নাই। তবে ব্রিটিশ পার্লেমেন্টে বাঙ্গালির স্থান কোথায়? বাঙ্গালিতে যে প্রকার

শক্তি এবং যে সামান্য একটু শক্তি আছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লে-মেণ্টস্থিত শক্তির সহিত মিশ্ খাইবেই বা কেমন করিয়া, পারিয়া উঠিবেই বা কেমন করিয়া? কোরিন্‌থিয় প্রণালীতে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাতে গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত যে স্তম্ভ তাহা কেমন করিয়া খাটিবে? ইংরাজের শক্তিতে ইংরাজের পার্লে-মেণ্ট গঠিত। অতএব সে পার্লেমেণ্ট ইংরাজকেই বুঝে, ইংরা-জের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাই মিটাইতে পারে। ভারতকে সে পার্লেমেণ্ট বুঝে না, বুঝিতে পারে না এবং পারিবেও না। সে পার্লেমেণ্ট কেমন করিয়া ভারতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে? সেই জন্যইত ব্রাইট ফসেটের ন্যায় সে পার্লেমেণ্টের মহা প্রতাপশালী ইংরাজ সভ্যেরাও ভারতের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না? তবে ক্ষুদ্র বাঙ্গালি সে পার্লেমেণ্টে গিয়া ভারতের জন্য কি করিবে? বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ধাত্‌ বুঝে না বলিয়া সে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা আমাদের অসারতার প্রমাণ মাত্র!

আর একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি হইবে না, ইংরাজেরই মান বৃদ্ধি হইবে। পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে গেলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না। একটু বুদ্ধি এবং একটু বাক্‌শক্তি থাকি-লেই পার্লেমেণ্টে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেরূপ একটু ক্ষমতা থাকিলে মানুষ যে বিশেষ সম্মানার্হ হয় তা নয়। তবে বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের কাছে কিসে যে সম্মানার্হ হইবে বুঝিতে পারা যায়

না। ফলতঃ বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বাড়িবে না, ইংরাজেরই মান বাড়িবে। বিজিতকে আপনার সর্ব্বোচ্চ অসীম-মহিমা-মণ্ডিত স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন শাসন সমিতিতে বসিতে দিলে প্রকৃত মানুষের কাছে ইংরাজেরই মান বাড়িবে, বাঙ্গালির মান বাড়িবে না। তবে সে সমিতিতে বসিবার জন্য বাঙ্গালি এত ব্যাকুল কেন? বাঙ্গালির দুর্বুদ্ধি কি ঘুচিবে না? বাঙ্গালির সুদিনের সূত্রপাত কি হইবে না?

বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র।

মোটা কথায় বলা যায় যে ইংরাজি সভ্যতা বহির্ম্মুখ আর হিন্দু-সভ্যতা অন্তর্ম্মুখ, ইংরাজি সভ্যতা ধনচর্য্যায় আর হিন্দু-সভ্যতা ধর্ম্মচর্য্যায়। অর্থাৎ ধন প্রভৃতি বাহ্যসম্পদ লইয়া ইংরাজি সভ্যতা এবং তাহার উন্নতিতে ইংরাজি সভ্যতার উন্নতি, আর ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু সভ্যতা এবং তাহার উন্নতিতে হিন্দু সভ্যতার উন্নতি। কিন্তু ইংরাজি সভ্যতা বহির্ম্মুখ বা বাহ্য-সম্পদ-মূলক হইলেও তাহা যে একেবারে ধর্ম্মশূন্য এমন কথা বলা যায় না। ইংরাজের খুব ধনসম্পদ আছে সত্য, কিন্তু ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্রও আছে, ধর্ম্মশিক্ষাও আছে, ধর্ম্ম মন্দিরও আছে, ধর্ম্মযাজকও আছে। ইংরাজের বৈষয়িক ভাব ও বিষয়াসক্তি প্রবল হইলেও তাহাদের অসীম মানসিক শক্তিও আছে। ইদানীন্তন কালে হব্‌স্‌, হিউম, লক, বর্কলি, মিল বা

হর্বর্ট স্পেন্সেরের অপেক্ষা মানসিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ কোন দেশে যে বড় বেশি জন্মিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। ইংরাজের মধ্যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবও আছে। যতদূর জানিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে ইংরাজের মধ্যে যথার্থই ঋষিতুল্য মানুষ আছেন—অন্তরে সদাই ঈশ্বরচিন্তা, বাহিরে সদাই সদাচার সদাই পরোপকার, প্রেমিক, অমায়িক, নম্র, নির্বিকার, শান্ত, শুদ্ধাচারী। তথাপি ইংরাজি সভ্যতা বহির্মুখ, ইংরাজের ধনচর্য্যাই বেশি, ধর্ম্মচর্য্যা কম। এত দার্শনিক, এত ধর্ম্মযাজক, এত ধর্ম্মমন্দির খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির ন্যায় এমন সুন্দর ধর্ম্মনীতি থাকিতেও ইংরাজ প্রধানত পৃথিবী লইয়াই ব্যস্ত, ইংরাজের ধর্ম্মচর্য্যা তত বেশি নয়। ইংলণ্ডে যাঁহারা ধর্ম্মভাব ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এবং মানসিক শক্তি বড়ই বেশি এবং উচ্চদরের। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশি নয় এবং তাঁহারা প্রায়ই কিছু উচ্চ শ্রেণীর লোক। ইংলণ্ডের লোক-সাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর লোক বড়ই বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মহীন ও দুরাচার। ভাল ভাল ইংরাজ-লেখকেরাই একথা বলিয়া থাকেন, এবং সম্প্রতি একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালি ইংলণ্ড দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ইতর শ্রেণীর লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। সাধারণ সংবাদপত্রও পড়ে। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির লোক মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে নাই। ইহাদিগকে দ্বিপদ পশু বলিলেও হয়। ধর্ম্ম যে কাহাকে বলে, ইহারা তাহা জানে না। সেন্টজাইল্‌সে ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষগণকে সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মদ্যপান করিয়া কলহ চীৎকার

করত পথিকগণের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। এখানে পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণের সাধ্য নাই। তাহাদিগকে পুলিশের শাসনের ক্ষমতা নাই। এই সকল মনুষ্যের আকার অতি ভয়ানক। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এতাদৃশ ইতর শ্রেণীর লোকের উৎপাত নাই। এই সকল লোকে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অসভ্যতা প্রকাশ করে। কখন 'ব্ল্যাকি' বলে, কখন বা তাহাদের সেই বানর অপেক্ষা কুৎসিৎ মুখ বিকৃত করিয়া দেখায়। এরূপ মনুষ্যনামধারী পশু আর কুত্রাপি দেখা যায় না।" *

ইহার অপেক্ষাও ভীষণ বর্ণনা ইংরাজ-লেখকদিগের সংবাদ পত্রে ও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর ন্যায় এককালে পশুবৎ ও রাক্ষসবৎ মানুষ পৃথিবীর সভ্যদেশের মধ্যে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ইংরাজের ন্যায় হিন্দুদিগের বাহ্যসম্পদ নাই, ব্যবসায়বাণিজ্য, কারবারকারখানা, রেলরোড টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নাই। কিন্তু ইংরাজের অপেক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষ আছে। এ কথাটি একটু বিশেষ অর্থে বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডের শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে, কিন্তু অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক নিতান্তই ধর্ম্মহীন ও অসচ্চরিত্র। হিন্দুর মধ্যে, কি শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক, কি অশিক্ষিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোক, সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত ধর্ম্মচর্য্যা ও

* নব্যভারত তৃতীয় খণ্ড, নবম সংখ্যা—"বাঙ্গালির ইউরোপ দর্শন" নামক প্রবন্ধ। অনাবশ্যক বলিয়া কিছু কিছু বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

চরিত্রোৎকর্ষ আছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত নাই সত্য, তত থাকাও সম্ভব নয়। ধর্ম্মচর্য্যা অর্থ ও অবসর সাপেক্ষ। নিম্ন-শ্রেণীর লোকের সে দুইয়েরই অভাব। অতএব উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত ধর্ম্মচর্য্যা বা চরিত্রোৎকর্ষ নাই। না থাকিলেও একথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ অনেকগুণ বেশি এবং একথাও ঠিক যে ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যত সৌসাদৃশ্য ও সমত্ব আছে, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। ধর্ম্ম এবং চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ, দুইটি অতি ভিন্ন জাতীয় লোক, সভ্যতার দুইটি অতি বিসদৃশ স্তরের লোক, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি বা অযথা উক্তি হয় না। ইংরাজ-জাতির শ্রেণী সকলের মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই পার্থক্য, বড়ই বিসদৃশ্য, বড়ই heterogeneity দৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা ও অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ যতটুকু পার্থক্য বা বিভিন্নতা ঘটিতে পারে তদপেক্ষা বেশি পার্থক্য বা বিভিন্নতা নাই। এবিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এক-জাতীয় এবং সভ্যতার একই স্তরের লোক। সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ধর্ম্ম-জ্ঞান ও চরিত্র সম্বন্ধে ঐক্য বড়ই বেশি, সৌসাদৃশ্য বড়ই বেশি, homogeneity বড়ই বেশি, বড়ই অপূর্ব্ব। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা বেশ ভাল রকম জানে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকে যীশু খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না।

একবার একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম,—একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডের একটি কয়লার খনির ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় যে সকল মজুর খাটিতেছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা যীশু খৃষ্টকে জান? তাহারা আপনারা বারকতক হীযু খৃষ্ট,ঝীশু খষ্ট প্রভৃতি নানা রকম বিকৃত আকারে যীশুখৃষ্টের নাম উচ্চারণ করিয়া উত্তর করিল—what lombore, "লম্বোর" অর্থাৎ নম্বর কত? কয়লার খনিতে মজুরদিগের নম্বর থাকে, নম্বর ধরিয়া তাহারা পরিচয় দেয়, তাহারা মনে করিয়াছিল যে যীশুখৃষ্ট যদি তাহাদের মধ্যে একজন নম্বরধারী মজুর হয়, তবেই তাহারা তাহার কথা বলিতে পারিবে, নচেৎ নয়! যে জাতির মধ্যে ম্যাণিং মিলমানের ন্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক যীশুখৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না! হিন্দুদিগের মধ্যে এমন হয় না। যে হিন্দু অতি নীচ এবং অশিক্ষিত সেও তাহার দেবদেবীর কথা জানে, দেবদেবীর পূজা করে, এবং সাধ্যমত ধর্ম্মচর্য্যা করে। আমাদের বাগ্‌দী দুলেরাও দোল দুর্গোৎসব করে, পুরাণ-কথা শুনে, স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করে, শ্রেষ্ঠকে সম্মান করে, দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানে ও ঘৃণা করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়, নিঃসহায় জ্ঞাতিকুটুম্বকে সাধ্যমত অন্নদান করে। আমাদের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে রকম দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাহাদের যে পরিমাণ ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা আছে তাহা নিতান্তই সম্ভবাতিরিক্ত এবং বিস্ময়কর। মোটা-মুটি ধরিতে গেলে এমন কথা বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মজ্ঞান

এবং ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে তাহারা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রায় সমতুল্য। তাই বলিতেছি যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে হিন্দুর ভিতর সকল শ্রেণীর মধ্যে যেমন অপূর্ব্ব সমত্ব, সৌসাদৃশ্য বা homogeneity আছে, ইংরাজ বা অপর কোন ইউরোপীয় জাতির ভিতর শ্রেণী সকলের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। এই অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্যের বা homogeneityর হেতু কি? কি কারণে হিন্দুর ভিতর উচ্চ শ্রেণীর লোকের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরও ধর্ম্মচর্য্যা এত বেশি এবং চরিত্র এত উত্তম?

এই আশ্চর্য্য সমত্ব বা সৌসাদৃশ্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে এবং বোধ হয় যে অনেক কারণই আছে। বোধ হয় যে প্রাকৃতিক কারণে এ দেশের লোকে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা বেশি ধর্ম্মশীল এবং সেই জন্য ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে ইউরোপ অপেক্ষা এ দেশে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বেশি সমত্ব বা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই সৌসাদৃশ্যের অন্যান্য কারণ এ স্থলে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব না। বর্ণ-ভেদ প্রথার সহিত এই সৌসাদৃশ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই এ স্থলে বুঝিয়া দেখিব।

পৃথিবীতে মানুষের সম্বন্ধ দুইটি জিনিসের সহিত। একটি পার্থিবতা অর্থাৎ ধন, যশ, প্রভৃতি পার্থিব ভোগসম্পদ, আর একটি আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিকতা অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-চর্য্যা। এই দুইটি ছাড়া আর কোন জিনিসের সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেন না পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মি-কতা ছাড়া আর কোন জিনিস নাই। মানুষের যাহা কিছু আছে তাহা হয় পার্থিবতার অন্তর্গত, নয় আধ্যাত্মিকতার অন্ত-

র্গত। এই জন্য মানুষকে ধর্ম্মপ্রধান করিতে হইলে তাহার পার্থিবতা কমাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানী লোকের কাছে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা পার্থিবতার সম্মান বা গৌরব যে বেশি তা নয়। ইংরাজি-সাহিত্যে ধর্ম্মের যত প্রশংসা এবং মর্য্যাদা, ধনসম্পদের তত মর্যাদা এবং প্রশংসা নয়। ইংরাজ-লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে ধনী বা বিদ্বান হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়া বেশি আবশ্যক। ইংরাজধর্ম্ম-যাজকেরা পার্থিবতাকে অতি হেয় বা অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিকতারই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং লোককে পার্থিব পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তথাপি ইংরাজ জাতি সাধারণতঃ পার্থিবতা-প্রিয় এবং ধর্ম্মহীন ও চরিত্র-ভ্রষ্ট। ইংরাজের সাহিত্য ও ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ইংরাজের জীবনের এ অনৈক্য কেন? ইংরাজ তাহার শিক্ষাদাতার শিক্ষা বুঝে নাই বা কেন, অথবা বুঝিয়া তদনুসারে জীবন নিয়মিত করে নাই বা কেন? বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, ইংরাজ শিক্ষক বা ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন বা উপদেশ দিলেও ইংরাজের জীবনের এবং সমাজের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নয়, পার্থিবতার উপর স্থাপিত। ইংরাজ ধর্ম্ম-যাজক ইংরাজকে বলেন—ধার্ম্মিক হও, ধন-সম্পদের লোভে ধন-সম্পদ লইয়া থাকিও না এবং পরকাল নষ্ট করিও না। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বা প্রকৃত জীবন-যাত্রায় ইংরাজ দেখে যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সম্মুখে অসীম আকারে স্থাপিত এবং বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাজমান, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর অবলম্বন করিতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে

সে সদাই আহূত। সে ধর্ম্ম-মন্দিরে শুনিয়া থাকে পার্থিব জীবন বড়ই অকিঞ্চিৎকর, ধনসম্পদ বড়ই অনিষ্টকর, পার্থিব ভাব সঙ্কুচিত করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া সে দেখে যে পার্থিবতার দ্বার তাহার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া পার্থিবতা তাহাকে মোহিনী মূর্ত্তিতে আহ্বান করিতেছে। তখন সে তাহার সেই কাণে-শুনা দুই চারিটা কথা ভুলিয়া যায়, প্রবল পার্থিবতার প্রবল প্রলোভন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে; সে পার্থিবতার নেশায় বিহ্বল হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মোপদেশ থাকিলে কি হইবে, ইংলণ্ডের জীবন-প্রণালী ও সমাজ-প্রণালী সে ধর্ম্মোপদেশের উপর স্থাপিত নয়, সে ধর্ম্মোপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী নয়, সে জীবন-প্রণালীও সমাজ-প্রণালী সম্পূর্ণ পার্থিবতা-মূলক এবং উভয় প্রণালীই পার্থিব নেশা বাড়াইয়া মানুষকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচার করিয়া ফেলে। এই জন্য সামান্য ইংরাজ এত দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু অতি সামান্য হিন্দুও অনেকাংশে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মশীল। তাহার কারণ এই যে, হিন্দু কেবল শাস্ত্রকার বা ধর্ম্মযাজকের মুখে পার্থিবতার অপকৃষ্টতা এবং ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্টতার কথা শুনে না। হিন্দুর জীবন-প্রণালীতে হিন্দু দেখে যে পার্থিবতার দ্বার বড়ই সঙ্কীর্ণ, পার্থিবতার পরিমাণ বড়ই কম, পার্থিবতার আয়তন নিতান্তই মাপা—জোঁকা, তাহার এ দিকেও যাইবার যো নাই ও দিকেও যাইবার যো নাই, পার্থিবতা লইয়া দম্ভ আস্ফালন বা বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়াইবার যো নাই। সেই এক স্থির নির্দ্দিষ্ট জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী

কর্ম্ম,—যাহা শত সহস্র পূর্ব্বপুরুষ করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে, আর আমার পরে আমার বংশে শত সহস্র উত্তরপুরুষ কেবল তাহাই করিবে। তবে পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র ত আর বাহাদুরি করিবার যায়গা নয়, সেখানে বাহাদুরি ত চলেও না। সে ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ যে সেখানে পাশমোড়া দিবারও স্থান নাই। যে সঙ্কীর্ণ স্থান-টুকু নহিলে নয়, তাহাই আছে। সে স্থানটা ভাল স্থান হইলে শাস্ত্রকারেরা কি তাহা এত ক্ষুদ্র করিয়া, এত স্বল্প পরিমাণে দিতেন? পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অর্থাৎ যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে পার্থিবতা প্রশ্রয় পাইয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়া ফেলে, পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অপকৃষ্ট বলিয়া হিন্দু তাহা এত সঙ্কীর্ণ আকারে পাই-য়াছে। পাইয়া কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সকল হিন্দুই বুঝিয়াছে যে পার্থিবতা অপকৃষ্ট এবং ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, এবং এইরূপ বুঝিয়াই কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সকল হিন্দুই ধর্ম্মচর্য্যায় প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণভেদে ব্যবসায়ভেদ অর্থাৎ বর্ণানুসারে স্থির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় এই আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে।

পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মচর্য্যা, মানুষের কেবল এই দুইটি জিনিসের সহিত সম্পর্ক। কারণ তৃতীয় জিনিস আর নাই। অতএব ইহার মধ্যে একটি যদি অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, অপরটি কাজে কাজেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ভারতে বর্ণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় হিন্দু পার্থিবতাকে অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং ধর্ম্মচর্য্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি-য়াছে। কাজেই হিন্দুর মনে পার্থিব ভাব অপেক্ষা ধর্ম্মভাব

প্রবল হইয়াছে। এখন এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে বর্ণভেদ প্রথার আর কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ধর্ম্মচর্য্যা সমস্ত হিন্দু-সমাজে বড়ই সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ণভেদ প্রথায় মানুষ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহার একটি ফল হয় এই যে, যে নিকৃষ্ট সে শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখে এবং শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখিলে শ্রেষ্ঠের আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়। সেইজন্য হিন্দুর মধ্যে নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের আচার ব্যবহার অনুসরণ করে। ইহার আর একটি ফল হয় এই যে যে শ্রেষ্ঠ সে নিকৃষ্ট হইতে এক-কালে বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠ সে তাহার নিকৃষ্টের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং যে নিকৃষ্ট সে তাহার শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে নিকৃষ্ট। অতএব একটা সূত্রে শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একটা না একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া যে বর্ণে নিকৃষ্ট, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয় এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠবর্ণ যাহাকে উত্তম জীবন প্রণালী বলিয়া অনুসরণ করে নিকৃষ্ট বর্ণও সেই জীবন প্রণালী অনুসরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অর্থের পরিমাণ ছাড়া শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সম্বন্ধ কিছুই নাই, এবং সেইজন্য সেখানে সকল লোকও যেমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও তেমনি কেবল অর্থের এবং পার্থিবতার অনু-সরণ করিয়া বেড়ায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যদি কাহারো জীবন-প্রণালী ধর্ম্মমূলক হয়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে সে জীবন-প্রণালী অনুসরণ করে না। এই দুই কারণে হিন্দুর ভিতর

শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এই দুই কারণের অভাবে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যেই সম্বদ্ধ আছে, নিকৃষ্ট শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত হয় নাই। ইহাত গেল শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বর্ণের সম্বন্ধ-সম্ভূত ফল।

আবার ধর্ম্মচর্য্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে বর্ণগত দুই একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। সাধারণ লোকে যতই কেন ধর্ম্মভাবাপন্ন হউক না, তাহারা একেবারে পার্থিব আসক্তি বা স্পৃহা পরিহার করিতে পারে না। সমাজে যশস্বী বা ক্ষমতাশালী হইতে তাহাদেরও ইচ্ছা হয়। কিন্তু সমাজ সমুদ্রবৎ সুদূর-প্রসারিত কূলকিনারা শূন্য হইলে, সাধারণ লোকের যশস্বী বা ক্ষমতশালী হইবার ইচ্ছা সহজে হয় না, হইলেও সে ইচ্ছা প্রায়ই মনের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যেখানে লোকসমাজ অনন্ত সাগর সদৃশ সেখানে তুমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাক, আমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাকি, তোমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা যেমন বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ, আমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা তেমনি বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ। যে সমাজে কত লোক রহিয়াছে এবং কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক রহিয়াছে, সে সমাজে তোমার আমার বড় হইবার আশা হইবেই বা কেমন করিয়া? এই ত আমাদের সামান্য বাঙ্গালা সাহিত্য-মণ্ডলীতে থাকিয়া দুকলম লিখিয়া যশোলাভের আশা করিতেছি,—কিন্তু কৈ চল দেখি, ইংলণ্ডের বিরাট-সাহিত্য-মণ্ডলীতে গিয়া কেমন করিয়া লিখিয়া যশোলাভ করিবার আশা

করিতে পারি? ইংলণ্ডে মনুষ্যসমাজ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ ও একাকার। সেখানে সামান্য এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইবার আশা সহজে হয় না। ভারতে হিন্দু-সমাজ সমুদ্রবৎ বৃহৎ কিন্তু ইংলণ্ডের মনুষ্য সমাজের ন্যায় একাকার নয়। হিন্দুসমাজ অনেক বর্ণে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণ সমস্ত সমাজের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। অতএব আপন আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইবার ইচ্ছা সকল হিন্দুরই সহজে হইতে পারে। সীমার ভিতরে সামান্য লোকও বড় হইতে পারে, অসীমের ভিতর অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বড় হইতে পারে না, বড় হইবার আশাও করিতে পারে না। যে আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইতে চায়, তাহাকে সমস্ত সমাজের বড় লোকের প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভয় করিতে হয় না, তাহার আপনার বর্ণের যাহারা বড়লোক কেবল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতারই ভয় করিতে হয়। সে ভয় বড় বেশি ভয় নয় এবং সেই জন্য এদেশে হিন্দুর ভিতর অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক লোকে সৎকর্ম্মের দ্বারা আপন আপন বর্ণের মধ্যে সম্মান ও সামাজিক ক্ষমতা লাভ করে। দেবালয়, সদাব্রত, অতিথিশালা, পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, সরাই, কূপ, কুঞ্জ, প্রভৃতি পরোপকারার্থ এবং পারলৌকিক হিতার্থ অনেক সৎকর্ম্ম এদেশে হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে। সকলেই বোধ হয় জানেন যে এই সকল সদনুষ্ঠান উচ্চশ্রেণীর হিন্দুতে যে পরিমাণে করিয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুতেও প্রায় সেই পরিমাণে করিয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্ণভেদ নাই বলিয়া সেখানে জনকতক করিয়া খুব বড় বা ভাল লোক হয়। কিন্তু ভারতে বর্ণভেদ আছে বলিয়া

সমাজের সকল শ্রেণীতে খুব বড় রকমের লোক না হউক, অসংখ্য ভাল লোক হয়—অতি নীচ জাতিতেও অনেক অতি উত্তম লোক দেখা যায়। হিন্দুসমাজে অসংখ্য গুহক চণ্ডাল দেখা যাইতে পারে, ইউরোপীয় সমাজে বোধ হয় দুই চারিটীর বেশী নয়, হয়ত তাও নয়।

আবার কোন একটি বর্ণের মধ্যে কেহ সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠাবান হইলে সেই বর্ণের মধ্যে অনেকেই তাহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণকে যে কারণে অনুকরণ করে, তাহারাও সেই কারণে সেই প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের অনুকরণ করে। অধিকন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আপন বর্ণের মধ্যে বর্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে বেশি ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া তাহার আপন বর্ণের লোক ভয়েও তাহার দৃষ্টান্তানুসরণ করে। এই প্রকারে বর্ণ বিশেষের দ্বারা বর্ণ বিশেষ ধর্ম্মপথে পরিচালিত হয়।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে হিন্দুর ভিতরে উচ্চ মধ্যম এবং নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব সমত্বসৌসাদৃশ্য বা homogeneity আছে, হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা তাহার একটী প্রবল কারণ। তবে কি বর্ণভেদ থাকিয়া যাইবে, বর্ণভেদ প্রথা উঠান হইবে না? বর্ণভেদ প্রথা থাকিবে কি না বলিতে পারি না, বর্ণভেদ প্রথা উঠান উচিত কি না, তাহাও এপ্রবন্ধে বলিতে প্রস্তুত নহি। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে কালে বর্ণভেদ প্রথার কি হইবে, তাহা এখন কাহারো বলিবার সাধ্য নাই। যাইবার হয়, সে প্রথা যাইবে, না যাইবার হয় থাকিবে; ভিন্ন আকারে থাকিবার হয়, ভিন্ন

আকারে থাকিবে। আমরা যথার্থই দৃষ্টিহীন এবং বুদ্ধিহীন। এত বড় সামাজিক কথা মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব বর্ণভেদ প্রথার কি হইবে একথার মীমাংসা করিবার চেষ্টাও করিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিব যে, শুধু উপদেশবাক্যে বা উচ্চভাবের জোরে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। উপদেশবাক্য উচ্চ প্রকৃতির লোকের জন্য—উচ্চভাব উচ্চদরের লোকের জন্য। কিন্তু সমাজ শুধু উচ্চদরের লোক লইয়া নয়, প্রধানতঃ সামান্য লোক লইয়াই সমাজ। কিন্তু সামান্য লোক শুধু উপদেশে আবদ্ধ হয় না, উচ্চভাবে মজিয়া উচ্চভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না। সমাজকে বাঁধিতে ও সদাচার সম্পন্ন করিতে হইলে, মুখের উপদেশও চাই, উচ্চভাবও চাই, আবার বর্ণভেদ, পারিবারিক শাসন, প্রভৃতি ঠেকাঠোকাও চাই। মানুষকে যেমন উপদেশ দিয়া এবং উচ্চভাবের তরঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই, আচার ব্যবহার সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঠেকাঠোকা দিয়াও তেমনি ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই। বর্ণভেদ ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি সকল প্রকার ঠেকাঠোকা ফেলিয়া দিয়া শুধু উচ্চ উপদেশ ও ভাবের উপর সমাজ দাঁড় করাইবার চেষ্টাও হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেব একবার সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। চৈতন্য দেব আর একবার সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজ এদেশে আর নাই বলিলেই হয়, আর বঙ্গের সাধারণ বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের কলঙ্কের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চৈতন্য দেবের পরম পবিত্র বিশ্বব্যাপী প্রেম পাশব প্রেমে পরিণত হইয়াছে! তাই বলি যে, শুধু উচ্চ উপদেশে বা ভাবে সমাজকে

বাঁধিয়া সৎপথে রাখা যায় না। সমাজকে বাঁধিতে বা সৎপথে রাখিতে হইলে উচ্চ উপদেশ ও উচ্চ ভাব যেমন আবশ্যক আচার ব্যবহার প্রথা প্রণালীরূপ সামাজিক ঠেকাঠোকাও তেমনি আবশ্যক। তাই উপসংহারে একটি কথা বলিতে হইতেছে। দেখিতেছি, এখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ণভেদ প্রথা ছাড়িয়া ইংরাজদের ন্যায় একাকারভাব অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহারা যদি বর্ণভেদ প্রথাকে যথার্থই বড় অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে সে প্রথা ছাড়িয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যেন শুধু উচ্চ উপদেশ বা উচ্চ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজ টিকিবে কি না সন্দেহ, সৎপথে কিছুতেই থাকিবে না। অতএব তাঁহারা যেন সামাজিক ঠেকাঠোকার অনুসন্ধান করেন এবং যত শীঘ্র পারেন ঠেকাঠোকা প্রয়োগ করেন। আর আমাদের সমস্ত হিন্দু জাতির সম্বন্ধে এই কথা বলিতে চাই যে, কালে আমাদের বর্ণভেদ প্রথা না থাকিতে পারে। না থাকিবার হইলে, কখনই থাকিবে না, এবং তখন সে প্রথাকে রাখিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। যদি সে প্রথা না থাকে, অথবা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া না চলে, তবে বড়ই ভয় হয় যে, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের বংশোদ্ভূত মহাপুরুষদিগকে সামাজিক ঠেকাঠোকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, এবং সামাজিক ঠেকাঠোকা না মিলিলে পবিত্র আর্য্যভূমের পবিত্র আখ্যা ঘুচিয়া যাইবে এবং অপবিত্র আর্য্যভূমে সেই মহাপুরুষদিগকে কোটি কোটি ধর্ম্মহীন চরিত্রভ্রষ্ট পিশাচের

সহিত এক বিকটাকার সমাজে কোন মতে দিন যাপন করিতে হইবে।

দেব-ধর্ম্মী মানব*।

দিন রাত্রি, আলো অন্ধকার, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, সুখ দুঃখ, তিক্ত মধুর, শীতল উষ্ণ, পৃথিবীব দুইটি দিক, দুইটি রূপ, দুইটি ভাগ। ইহার মধ্যে একটি মাত্র দেখিলে পৃথিবী দেখা হয় না; পৃথিবীর অর্দ্ধেকও দেখা হয় না। যে শুধু তিক্তরস আস্বাদন করিয়াছে, কখনও মধুর রস আস্বাদন করে নাই, সে তিক্তরসও আস্বাদন করে নাই। অতএব পৃথিবী বুঝিতে হইলে তাহার দুইটি দিকই বুঝা আবশ্যক, একটি দিক মাত্র বুঝিলে তাহার কোন দিকই বুঝা হয় না। কিন্তু পৃথিবীর যেমন মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক আছে। একটি ভাল দিক একটি মন্দ দিক। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষ এক দিকে পশু, আর একদিকে দেবতা। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, কথাটা ঠিক যে মানুষ এক দিকে পশু আর এক দিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশু-ধর্ম্মও বুঝা চাই, দেবতা-ধর্ম্মও বুঝা চাই। অক্ষয় বাবুর কল্যাণে পাঠক পশু বা জন্তু-ধর্ম্মী-মানব দেখিয়াছেন। এখন তাঁহাকে দেব-ধর্ম্মী মানব দেখাইব।

---

* নবজীবনে অক্ষয় বাবু 'জন্তু-ধর্ম্মী মানব' এই নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি এই প্রবন্ধটি লিখি। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে দিলাম।

জন্তু-ধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেব-ধর্ম্মী মানবও নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির। জন্তু-প্রকৃতিও যেমন বহুবিধ, দেব-প্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। জন্তুর মধ্যে সর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কক্কুর, মার্জ্জার, প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। অতএব জন্তু-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যে সকল রকমের মনুষ্য যেমন বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না দেবতা-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যেও তেমনি সকল রকমের মনুষ্য বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। ফলতঃ সকল রকম বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই তিন রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষের কথা বলিলেই পাঠক সকল রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষ ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। অতএব তাহাই করিব।

—তত্র অন্নপূর্ণা-ধর্ম্মী।

জগন্মাতা অন্নপূর্ণা জগৎকে অন্ন দিয়া রক্ষা করেন। মনুষ্য মধ্যেও অন্নপূর্ণা আছে।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন তুমি আমিও একটু একটু দেখিয়াছি—সেইদিনকার সেই পিতামহ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। পিতামহ ঠাকুরের গৃহে লোক ধরে না—স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভাইপো আছেই ত। কিন্তু আরো যে কত আছে তাহা বলিতে পারি না। আহা! জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল পুরুষ বল যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে সেই আমার পিতামহ ঠাকুরের গৃহে পুত্র কন্যা অপেক্ষাও প্রিয়, গৃহদেবতা অপেক্ষাও সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষাও সম্মানিত।

পিতামহ ঠাকুরের বেশভূষা নাই—তাঁহার পায়ে একটি যোড়া খড়ম, পরণে এক খানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি সেইরূপ উত্তরীয়। তাঁহার ভোগবিলাস নাই—তিনি গাড়ী ঘোঁড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র, ভোজন করেন আশ্রিত অনাথা অনাথিনীরা যা তাই, তাহার চেয়ে খারাপ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয় সম্পদের ভাবনা নাই—তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা—তাঁহার একমাত্র ভাবনা, কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙ্গালগুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বোঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে, তখনও তিনি আহার করেন নাই, কেন না তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতে-ছেন পাড়ার হাড়ি মুচি কাওরা কৈবর্ত্তের মধ্যে কাহারো অন্ন জুটিল কি না। যাহার অন্ন যুটে নাই তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপনি বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় স্বয়ং এক মুটা ভক্ষণ করিলেন। তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা। তেমন অন্নপূর্ণা আমরা আর দেখিব না। আমাদের সে অন্নপূর্ণার পুরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আর সেই রাঙ্গা দিদির কথা মনে পড়ে কি? সেই অসা-মান্ত রূপলাবণ্যসম্পন্না সেই কালের-ছায়া-মাখা-রক্তপদ্ম-রূপিণী বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে পড়ে কি? যদি মনে না পড়ে তবে সেই কৈলাসবাসিনী ভিখারী ভূতনাথের অন্নপূর্ণাকে মনে কর, তাহা হইলেই সেই বঙ্গের বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে করা হইবে। "তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলুথালু কাল কেশরাশি কপালের উপর ভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী

ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারিণী, রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন, তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর, তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না। আম হউক বা কুল হউক, রাঙ্গাঠাকরুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারো মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেরু, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রী-ব্রতদানে রাঙ্গাদিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না *।"

এ রাঙ্গাদিদিকে যে মানবী বলে দেবতা কাহাকে বলে সে জানে না। হিন্দুর গৃহে গিয়া অন্নপূর্ণারূপিণী হিন্দুবিধবাকে দেখিলে সে প্রকৃত দেবতত্ব শিখিতে পারে। রাঙ্গাদিদির ন্যায় অন্নপূর্ণা এখনও আমাদের ঘরে আছে। তাই আমরা এখনও একেবারে উৎসন্ন হই নাই। তাই বিষ্ণু এখনও আমাদিগকে পালন করিতেছেন এবং বিষ্ণুপালিত বিশ্বে আমাদের এখনও দাঁড়াইবার স্থান আছে। তাই মনুষ্য মধ্যে আমাদের মনুষ্য বলিয়া এখনও কিছু মান সম্ভ্রম আছে।

আমার মেজকাকী আর একটী অন্নপূর্ণা। মেজ কাকীর বয়স চল্লিশের বেশি, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পাতলা ছিপছিপে,

* জটাধারীর রোজনামচা নামক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠা। রাঙ্গাদিদি কবির কল্পনা নয়, এক সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঙ্গাদিদি যথার্থই জীবিত ছিলেন, একথা আমরা জানি। রাঙ্গাদিদির আসল নাম ছিল অন্নপূর্ণা।

যেন ক্ষুদ্র চাঁপার কলিটি। মেজকাকী গৃহের মধ্যে একজন গৃহিণী কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজকাকীর গলা নাই, তিনি এখনও আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কন। মেজকাকীর ছেলেপুলে নাই। মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা। কিন্তু মেজকাকীর ঘরে ছেলে ধরে না। ঘোষেদের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলেমেয়ে, মেজকাকীর ঘরে সদাই ছেলের হাট। মেজকাকী কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাইতেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতেছেন। মেজকাকী উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে আসিতেছে। মেজকাকী ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এপাশে ওপাশে সামনে পিছনে ছেলের পালও 'ঠাকুল বাল কল' বলিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। রাত্রি এক প্রহর, তখনও মেজকাকীর ঘরে পাঁচটা ছেলে। মেজকাকী তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাইয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজকাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মার আর পাঁচটা ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজকাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজকাকীর একটি পয়সাও খরচের দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ মিঠাই খৈ বাতাসায় তাঁহার মাসে পনর ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজকাকা একটু একটু

আফিঙ্গ খান, তাই তাঁহার প্রতিদিন সেরটাক্ দুধের দরকার, তার বেশি নয়, কিন্তু প্রতিদিন তাঁহার ঘরে পাঁচ ছয় সের দুধ খরচ হয়। মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা, কিন্তু দিনে রেতে তাঁহার সাবকাশ নাই—এমন কি, মেজকাকা পাঁচ বার চাহিয়াও একবার এক ঘটি জল পান না। মেজকাকী জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা, স্নেহের ভিখারী শিশুকে তিনি দিবারাত্রি স্নেহ সুধা পান করাম।

আর ঐ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও এক ঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন, জ্ঞাতির ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও যেমন জ্ঞাতির ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে ওঁর সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতি কষ্ট পাইলে ওঁর প্রাণ কাঁদিতে থাকে। জ্ঞাতিও যেমন ওঁর আপনার গ্রাম শুদ্ধ লোকও তেমনি ওঁর আপনার। উনি সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে। উঁনি 'কোম্পানির ছোট দাদা'। ওঁর গুণে সমস্ত গ্রাম খানি একটি কোম্পানি—এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে হাসে। উঁহাকে ধরিয়া গ্রামখানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রাম খানির প্রাণ। উনি গ্রামের অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়! উঁহাকে এখন আর বড় দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পানির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর বড় পাই না। বঙ্গদেশ এখন দেবতাশূন্য হইতেছে।

সত্যই বঙ্গে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে! তুমি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজের কতই নিন্দা কর এবং বলিয়া থাক যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে সমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহস্র দোষ সত্বেও সে সমাজে দেবতা ও দেব-চরিত্র ছিল। সে দেবতা ও দেব-চরিত্র হারাইয়া তোমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তোমাদের কথিত উন্নতি তাহার এক শতাংশও পূরণ করিতে পারিবে না। গুণ বল, বুদ্ধি বল, বিদ্যা বল, স্বাধীনতা বল, সাম্য বল, চরিত্রের সমান কিছুই নয়। আমরা সেই চরিত্র হারাইতেছি। বিধাতা জানেন আমাদের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে।

—তত্র দিকপালধর্ম্মী।

হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পাল দেখিতে পাই। সকল দিক রক্ষিত না হইলে কোন দিকই থাকে না। আপনার দিকও যায়। সেই জন্য দিক্‌পাল চাই। মনুষ্য মধ্যেও দিক্‌পাল-ধর্ম্মী আছে। গর্ডন ও গারিবল্‌দি উচ্চ শ্রেণীর দিকপাল। গর্ডন যখন সুদানে ও চীন দেশে যান তখন দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। গারিবল্‌দি যখন গাম্বেতার রিপব্‌লিকের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যান তখন তিনি দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। একটা দিক যখন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন দিকপাল বরুণ যেমন বারিবর্ষণ করিয়া সেই দিকটা রক্ষা করেন, তেমনি পৃথিবীর এক একটা দিক যখন উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন গর্ডন ও গারিবল্‌দি দিকপাল স্বরূপ সেই সেই দিক রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত বড় দিকপাল পৃথিবীতে বড় কম। সামান্য

সংসারধর্ম্মী মানবের অত বড় দিকপালের কথা শুনিয়াও বিশেষ লাভ নাই। অতএব সমাজে নিত্য যে সব ছোট ছোট দিক-পাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের কথা বলাই ভাল। আগে আমাদের সমাজে তেমন ছোট ছোট দিকপাল অনেক ছিল। রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ৩০।৩৫। রঘুনাথ অসহা-য়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটি বৃহৎ ক্রিয়া। তোমার লোকবল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিল, চালাচুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোকজন খাওয়াইয়া দিল। দশ দিন ধরিয়া রঘুনাথ এই সব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে। রঘুনাথ তোমাকে নমস্কার করিয়া গিয়া তাহার পর দিন হইতে আবার ঐ সিংহ মহাশয়ের কন্যার বিবা-হের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসুয়া নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক একেবারে ভোজন করিতে বসিয়াছে, আর ঐ যে রঘুনাথ—যুবা রঘুনাথ, দীর্ঘাকার রঘুনাথ, বলিষ্ঠ রঘুনাথ—কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষ মাসের দারুণ শীতে ধর্ম্মাক্ত কলেবরে অসুর বিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষীর দধি মিঠাই মোণ্ডা পরিবেশন করিতেছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পদ ভরে টলমল করিতেছে। বল দেখি, রঘুনাথ যথার্থই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিকপাল কি না। আবার মিত্র মহা-শয়ের অন্দরে যাও—সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে, তিনিও

এক দিক্‌পাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রঘুনাথের মা রন্ধন করিতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ান, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘু-নাথের মা অসীম উৎসাহে অসীম তেজে রন্ধন করিতেছেন। মিত্র বাড়ীর গৃহিণী বারম্বার বলিতেছেন—রঘুর মা, এক ফোঁটা চিনির পানা গলায় দিয়া যাও। রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই। বল দেখি, রঘুনাথের মা যথার্থ অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিক্‌পাল কি না।

দিক্‌পাল-ধর্ম্মীকে দিবাভাগে কেহ তাহার আপন বাড়ীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখন হউক, রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে। রঘুনাথের সাড়া শব্দ পাইলে না। আবার ডাকিলে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল—বাবা বাড়ীতে নাই,ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষে-দের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ানশালায় ভোক্তার সংখ্যার সহিত হিসাব করিয়া মিষ্টান্নের পরিমাণ ঠিক্ করিতে-ছেন। রঘুনাথ কখন্ একটিবার বাড়ীতে আসিয়া চারিটি ভাত খাইয়া যায় কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। রাত্রিকালে দিকপালধর্ম্মীর নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয় তাহাও কাক-নিদ্রাবৎ, একটা টিক্‌টিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রায়ও দিক্‌পাল-ধর্ম্মীর কর্ণ চারিদিকে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমৃকাইতেছে। দিক্‌পাল রঘুনাথ ঘুমাইয়াও

জাগ্রত। রোদনধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথিনী হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার ন্যায় আরো ২।৩টি দিক্‌পালকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার্য্য করিয়া আসিলেন। রঘুনাথ দিক্‌পাল বৈ কি—রঘুনাথ দেবতা। কিন্তু রঘুনাথকে আর বড় দেখিতে পাই না। রঘুনাথ সভ্য হইয়া কিছু সৌখিন হইয়াছেন। রঘুনাথ এখন সর্ব্বত্র উঁকি ঝুঁকি মারেন, কিন্তু ঘাড় পাতিবার ভয়ে কোথাও আর দেখা দেন না। রঘুনাথ এখন বাবু। আমাদের কি কম উন্নতি হইয়াছে!

—তত্র নারায়ণ-ধর্ম্মী।

অনন্ত শয্যা-শায়ী নারায়ণ স্বয়ং কিছু করেন না। তিনি সেই অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া এক রকম নিদ্রিত বলিলেও হয়। সব জানেন, সব দেখেন, কিন্তু নিদ্রিত। দেবতারা যখন বিপদে পড়েন, কি করিলে বিপদের শান্তি হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নারায়ণের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া বিপদ খণ্ডন করেন। গ্রামবৃদ্ধ গুরুচরণ সরকার মহাশয়ও নারায়ণ-ধর্ম্মী। তাঁহার বড় একটা নড়া চড়া নাই। দিবা রাত্রি সেই বহির্ব্বাটীর বৈটকখানার ঘরটির ভিতর বসিয়া আছেন। একখানি মাদুরের উপর একখানি ক্ষুদ্র তোষক, তদুপরি বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি হুঁকা, তাহাতে একটি পাতার নল। এক পাশে একটি জলপাত্র, তদুপরি এক খানি পাট-করা গাম্ছা। ঘরের দেয়ালে দুই চারিখানি ঠাকুর-দেবতার পট। ঘরে সর্ব্বদাই দুই একটি লোক আছে। গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আইসে। তিনি

গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ এবং গ্রামের সকল লোকের সকল কথাই জানেন। তিনি গ্রামের মধ্যে গ্রামের সর্ব্বজ্ঞ ও গ্রামের ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তাই সকলেই তাঁহার পরামর্শ লইতে আইসে। তিনিও তাহাদের সমস্ত কথা সমস্ত ইতিহাস জানেন, তাহারাও তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করে না, গোপন করা প্রয়োজনও মনে করে না। তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিবার কোন কথাও তাহাদের নাই। যাহারা শাস্ত্রানুসারে ও গ্রামবৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশানুসারে সংসার-ধর্ম্ম করে, তাহাদের কাহারো নিকটে গোপন করিবার কোন কথা থাকে না। তাই গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয় বাল্যকাল হইতে তাহাদের সকলের সকল কথা জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা পিতামহের নিকট তাহাদের সকলের আগেকার সকল কথা শুনিয়াছেন। এখনকার মতন লোকের ঘরের কথা জানিয়া তাহাদের কুৎসা রটাইবার জন্য জানেন নাই। সদুপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবেন বলিয়া তাহাদের সকল কথা জানিয়াছেন। তাই তাহারাও তাঁহার কাছে কোন কথা গোপন করে না এবং তিনিও সকল কথা শুনিয়া ঠিক পরামর্শ দিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে বিধাতা হওয়া যায় না। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জগতের বিধাতা এবং দেবতারাও তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পান। গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ও গ্রাম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ। তাই তিনি গ্রামের বিধাতা এবং গ্রামের সকল লোকই তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পায়। সামান্য সংসারী লোকের পক্ষে তেমন একটা

বিধাতা বা পরামর্শদাতা থাকা কি কম সুখ ও সৌভাগ্যের কথা? ইউরোপ বলেন এবং আমরাও ইউরোপের দেখাদেখি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আপনার বিষয়কর্ম্মে আপনিই আপনার উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা, অন্যে ঠিক পরামর্শ দিতে পারে না। এ কথার গূঢ় অর্থ এই যে, ইউরোপে কেহ কাহাকে আপনার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বুঝে না এবং সেই জন্য কেহ কাহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া আপনার সকল কথা খুলিয়া বলে না। এই কারণে ইউরোপীয় সমাজে কেহ গ্রাম-বৃদ্ধ সরকার মহাশয়ের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য ঠিক পরামর্শও দিতে পারে না। তাই ইউরোপীয় সমাজে নারায়ণ বা বিধাতা-ধর্ম্মী মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজও ইউরোপীয় সমাজের সমান হইয়া আসিতেছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারায়ণ-ধর্ম্মী মানুষের আর স্থান নাই। আমরা ধর্ম্মানুসারে চলি না। তাই আমরা কাহাকেও আমাদের সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি না এবং সেই জন্য কেহ আমাদিগকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারেন না। অগত্যা আপনি আপনার পরামর্শদাতা হইলে যে ভুল ভ্রান্তি হয় তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। এবং আপনি আপনার পরামর্শদাতা হইয়া আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধিকে এতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইতেছি যে অন্যে ঠিক কথা বলিলেও তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে অক্ষম হইতেছি এবং আপনার ভুল ভ্রান্তি হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে অশক্ত হইতেছি। ইহার অপেক্ষা উন্নতির প্রতিকূল অবস্থা আর কি হইতে

পারে? নারায়ণ-ধর্ম্মী মনুষ্য হারাইয়া আমরা দৈব-বল হারাইতেছি।

আমরা লেখাপড়া করিতেছি, গাড়িঘোঁড়া চড়িতেছি, পুস্তকপ্রবন্ধ লিখিতেছি, সমাজসংস্কার করিতেছি, সংবাদপত্র লিখিতেছি, এখানে যাইতেছি ওখানে যাইতেছি, সভা সমিতি করিতেছি, বড় বড় বক্তৃতা করিতেছি। এত তাড়াতাড়ি এত কাণ্ড করিলে সকল দেশে সকলেরই মনে হয়, কতই উন্নতি করিতেছি। কিন্তু একবার নিশ্বাস ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত যে আমরা প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতেছি না অবনত হইতেছি—আমাদের মধ্যে যে দেবচরিত্র ছিল, যে দেবচরিত্র মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ও আভরণ সে দেবচরিত্র লয় প্রাপ্ত হইতেছে কি পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। আমি কিছুরই বিরোধী নহি—গাড়িঘোঁড়া, পুস্তকপ্রবন্ধ, সমাজ সংস্কার, সভাসমিতি—কিছুরই বিরোধী নহি। কিন্তু সে সমস্ত পূর্ণ মাত্রায় পাইয়াও যদি সেই দেবচরিত্র হারাই, তবে অবশ্যই বলিব আমাদের সে সব পাওয়া বৃথা হইল। সে সব পাইয়া আমাদের লাভ কিছুই হইল না, বরং মর্ম্মঘাতী ক্ষতি হইল।

পাপপুণ্য।

পুণ্য কিসে হয়, পাপ কিসে হয়, এই প্রশ্ন আজকাল কাহারো কাহারো মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে বড় একটা শুনা যাইত না। এখন যাঁহারা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারা পূর্ব্বের প্রশ্নকারিদিগের ন্যায় তর্ক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করেন না। পাপপুণ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া ধর্ম্মপথে চলিবার বাসনা-তেই জিজ্ঞাসা করেন বলিয়া বোধ হয়। তার্কিকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কথাই চলে না, এবং বোধ হয় যে কোন কথা হওয়াও উচিত নয়। ধর্ম্মকথাকে তর্করূপ ক্রীড়া বা কৌতুকের বিষয় হইতে দেওয়া অধর্ম্ম। ধর্ম্মপিপাসুর সহিতই ধর্ম্মকথা কহিতে হয়। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু হইয়া পাপপুণ্যের প্রকৃতি বুঝিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখিলাম।

কিসে পুণ্য হয় এবং কিসে পাপ হয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এ প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় এবং দার্শনিকেরা প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন লইয়া বিষম গণ্ডগোল করিয়া থাকেন। সেই সকল উত্তর ও দার্শনিক মতের সমালোচন নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মের পথ সোজা, তর্কজালে আকীর্ণ নয়। অতএব যে সকল ধর্ম্মপিপাসু পাপপুণ্যের প্রকৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে সোজা উপায়ে পাপপুণ্যের প্রকৃতি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে সোজা উপায়, হিন্দুধর্ম্মে পাপপুণ্য কাহাকে বলে তাহাই বুঝিয়া দেখা।

একটু অভিনিবেশ সহকারে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে যে কার্য্য মুক্তির অনুকূল তাহা পুণ্য এবং যে কার্য্য মুক্তির প্রতিকূল তাহা পাপ। অতএব পাপপুণ্যের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে মুক্তি কাহাকে বলে তাহা অগ্রে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। মুক্তির অর্থ জীবাত্মার প্রকৃতি পরিত্যাগ বিনাশ বা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার প্রকৃতি লাভ করা। জীব বা মনুষ্য সাধারণতঃ নানা ইন্দ্রিয়ের বশ, হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ প্রভৃতি নানা দুষ্প্রবৃত্তির অধীন, বিষয় বাসনা যশোলিপ্সা প্রভৃতি নানা কামনায় উত্তেজিত। অতএব সাধারণ জীব বা মনুষ্য কখনও সুখ ভোগ করে, কখনও দুঃখ ভোগ করে, কখনও উল্লসিত, কখনও বিসন্ন, কখনও আহ্লাদে গদগদ, কখনও শোকে অভিভূত, কখনও স্বচ্ছন্দভোগী, কখনও যন্ত্রণায় অস্থির, কখনও হিংসায় জরজর, কখনও ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত, এই রূপ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভিন্ন অবস্থাপন্ন। যাহার মনের অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হয়, যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোহে আচ্ছন্ন, শোকে অভিভূত, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য বা লোভে মুগ্ধ হয়, সে কখনই প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারে না, আপনাকে আপনি জানিতে পারে না, আপনাকে আপনি পরিচালিত করিতে পারে না, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্মচর্য্যা করিতে পারে না। সে এই মুহূর্ত্তে যে ব্যক্তি পর মুহূর্ত্তে তাহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তাহার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়প্রধান পশুর অস্তিত্ব হইতে বড় ভিন্ন নয়। অতএব আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে জীবপ্রকৃতি বা জীবের অস্তিত্ব বড়ই হেয় বড়ই অপকৃষ্ট। এবং

যাঁহার বুদ্ধি ও সদ্‌বৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদ্রেক হইয়াছে বোধ হয় তিনি স্বীকার করিবেন যে এরূপ প্রকৃতি বা অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষেই বড় অধম। শুধু আমাদের মধ্যে নয়, সকল দেশেই জ্ঞানীও ধার্ম্মিক লোকেরা এরূপ প্রকৃতি বা অস্তিত্বকে অধম মনে করিয়া থাকেন এবং এরূপ প্রকৃতি বা অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বা অস্তিত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রহ্মপ্রকৃতি বা ব্রহ্মের অনুরূপ প্রকৃতিই সেই শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের অস্তিত্বের অনুরূপ অস্তিত্বই সেই শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব। এখন, ব্রহ্মের অর্থ সচ্চিদানন্দ—সৎ, নিত্য পরিবর্ত্তন-বিবর্জ্জিত অস্তিত্ব; চিৎ, বিশুদ্ধ ভ্রমশূন্য বিমল চৈতন্য; আনন্দ, নির্ম্মল নিরাধার নিত্য আনন্দ। মনুষ্যের ভাষায় ব্রহ্মের অর্থ নির্দ্দেশ করা যায় না, ব্রহ্মপদার্থ মুক্তমনুষ্যের আত্মাতেই উপলব্ধ। তথাপি ব্রহ্মের যে মোটামুটি অর্থ করিলাম তাহা গ্রহণ করায় ক্ষতি নাই।

এখন একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যাইবে যে জীবপ্রকৃতি ও ব্রহ্মপ্রকৃতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে পরিবর্ত্তনশীলতা বা অনিত্যতা, আচ্ছন্নতা ও বিকারগ্রস্ততা জীবপ্রকৃতির লক্ষণ এবং তদ্বিপরীত পরিবর্ত্তনাভাব বা নিত্যতা, নির্ম্মলতা ও নির্ব্বিকারত্ব ব্রহ্মপ্রকৃতির লক্ষণ। যাঁহারা জীবপ্রকৃতি দমন করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ এই প্রভেদ বিশিষ্টরূপে বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু অপরকেও এই প্রভেদের কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ক্ষণেক সূর্য্যালোকোদ্দীপ্ত, ক্ষণেক ঘন কৃষ্ণ

মেঘচ্ছায়ায় তামসীকৃত, ক্ষণেক নির্ম্মল নিষ্কম্প, ক্ষণেক বাত্যান্দোলিত আবিলসলিলা সরোবর—এই এক জিনিস, ইহা জীবপ্রকৃতির অনুরূপ; আর চিরালোকিত, চির নির্ম্মল, চির নিষ্কম্প চিরপ্রফুল্ল সরোবর—এই এক জিনিস, ইহা ব্রহ্মপ্রকৃতির অনুরূপ। যাঁহার শরীর সর্ব্বদা রুগ্ন, যিনি সর্ব্বদা রোগের নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেন, জীবপ্রকৃতি কি ধরণের জিনিস তিনি হয়ত বুঝিবেন,আর তাঁহার শরীর যদি কখনও নিরোগ হয়, এমন কি একটী মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যদি আর তাঁহাকে অতি সামান্য শিরঃপীড়ার যন্ত্রণাও জানিতে না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রকৃতি কি ধরণের জিনিস তিনি হয়ত বুঝিবেন। এক সময়ে কামক্রোধাদির তাড়নায় কখনও জর্জ্জরিত, কখনও প্রজ্জ্বলিত, কখনও জ্ঞানভ্রষ্ট, কখনও শোকাচ্ছন্ন, কখনও ব্যাকুল, কখনও উন্মত্ত, কখনও হতাশ, কখনও উল্লসিত, কখন চিন্তানিমজ্জিত হইবার পর যিনি বয়োধিক্য বশতঃ বা আত্মসংযমের গুণে দেহের মনের হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব অনুভব করেন জীবপ্রকৃতি কি ধাতুর জিনিস এবং ব্রহ্মপ্রকৃতি কি ধাতুর জিনিস তিনি হয়ত কিঞ্চিৎ বুঝিবেন। যে টুকু বুঝিবেন সে কিছুই নয় বলিলেই হয়, কারণ জীবপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মপ্রকৃতির প্রভেদের পরিমাণ যথার্থই অপরিসীম এবং অপরিসীম সাধনা ব্যতীত তাহা উপলব্ধ হইবার নয়। আমাদের ন্যায় সাধনাহীন লোকের দ্বারা উপমার সাহায্যে তাহা উপলব্ধ হওয়া এক রকম অসম্ভব। তথাপি উপমাদি দ্বারা যতটুকু হৃদঙ্গম হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিতে হইবে যে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে অধম জীবপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব ব্রহ্মপ্রকৃতি লাভ করার নাম মুক্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে যে কার্য্য মুক্তির অনুকূল তাহাই পুণ্য এবং যে কার্য্য মুক্তির প্রতিকূল তাহাই পাপ। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে যে কার্য্য মানুষকে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী করে বা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে ব্রহ্মপ্রকৃতির অনুরূপ করিয়া তোলে তাহা পুণ্য এবং যে কার্য্য মানুষকে ব্রহ্ম হইতে দূরে লইয়া যায় বা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে ব্রহ্মপ্রকৃতির বিপরীত করিয়া তোলে তাহা পাপ। অর্থাৎ যে কার্য্য মানুষের আবেশ-আচ্ছন্নতা-পরির্ত্তনশীলতাপূর্ণ প্রকৃতি নষ্ট করিয়া তাহাকে জ্ঞানালোকপূর্ণ আক্ষেপ-আবেশ-বিবর্জ্জিত নির্ব্বিকার নিত্যত্ববোধক প্রকৃতি লাভ করিতে সক্ষম করে তাহা পুণ্য এবং যে কার্য্য মানুষের আবেশ-আচ্ছন্নতা-পরিবর্ত্তনশীলতা-পূর্ণ প্রকৃতিকে আরো আবেশ-আচ্ছন্নতা-পরিবর্ত্তনশীলতাপূর্ণ করে তাহা পাপ। মোট্ কথা এই যে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রহ্ম মনুষ্যের চরম আদর্শ এবং যে কার্য্য মনুষ্যকে সেই চরম আদর্শানুসারে আপন চরিত্র বা প্রকৃতিকে উন্নত করিতে সক্ষম করে তাহা পুণ্য এবং যে কার্য্য মনুষ্যকে সেই চরম আদর্শানুসারে আপন চরিত্র বা প্রকৃতিকে উন্নত করিতে অক্ষম করে তাহা পাপ। হিন্দুশাস্ত্রে পাপপুণ্যের অন্য অর্থ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন এই অর্থে পাপপুণ্য বুঝেন না, বড় ভিন্ন অর্থে বুঝেন। এখন অনেকে পুণ্যের সহিত চরিত্রের বা মানসিক প্রকৃতির উন্নতির সংস্রব বা সম্পর্ক বুঝেন না ও দেখেন না। চরিত্র ভাল হউক আর নাই হউক, মনে পাপ থাকুক আর নাই থাকুক, গঙ্গাস্নান করিলেই পুণ্য হয়, তীর্থদর্শন করিলেই পুণ্য হয়, উপবাস ব্রত করিলেই পুণ্য হয়—

অনেকেরই এইরূপ সংস্কার। কিন্তু ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর সংস্কার আর হইতে পারে না। এই বিষম অনিষ্টকর সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করি বলিয়া আমাদের মধ্যে প্রকৃত পুণ্যের এত অভাব এবং ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ এত কম। গঙ্গাস্নান করিলে পুণ্য হয় একথা সত্য—কিন্তু গঙ্গা কি জিনিস, গঙ্গার উৎপত্তি কোথায়, লয় কিসে, গঙ্গার সলিলের সহিত ভারতের সভ্যতার কি সংযোগ, যুগযুগান্তর হইতে গঙ্গার সলিল ভারতবাসীর কি উপকার করিতেছে—এই সকল উচ্চ ও সুন্দর ভাবে ভোর হইয়া গঙ্গাস্নান না করিলে গঙ্গাস্নান করিয়া কি মন উন্নত ও বিশুদ্ধ হয়, না পুণ্য সঞ্চয় করা যায়? তীর্থদর্শন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, বারব্রত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তীর্থদর্শন করিতেও চিত্তসংযম চাই, বারব্রতাদি করিতেও চিত্তসংযম চাই। তীর্থদর্শনের ফলস্বরূপ চিত্তের বিশুদ্ধতা হওয়া বা বৃদ্ধি হওয়া চাই। বারব্রতাদির ফলস্বরূপও চিত্তের বিশুদ্ধতা হওয়া বা বৃদ্ধি হওয়া চাই। নহিলে তীর্থদর্শনেও পুণ্য হয় না, বারব্রতাদিতেও পুণ্য হয় না। এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করা এখন আমাদের বড়ই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই কথাগুলি বিস্মৃত হওয়াতেই এত ধর্ম্মচর্য্যা সত্বেও আমাদের মধ্যে প্রকৃত পুণ্য বা ধার্ম্মিকতা এত কম হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সমাজে সংস্কার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মাত্রেরই এই গুরুতর সংস্কারে প্রাণপণে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সকলে আপন আপন পরিবারে এই সংস্কার সাধনে যত্নবান হইলে ইহা সহজেই সংসাধিত হইবে। এ সংস্কার সাধন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী।

পুণ্য সম্বন্ধে যেমন পাপ সম্বন্ধে ও আমরা তেমনি ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছি। আমরা মনে করি যে যদি আমরা কেবল অখাদ্য ভক্ষণ না করি, ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করি, সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাই তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আমাদের চিত্ত কলুষিত ও বিকারগ্রস্ত হইলেও আমাদের পাপাচরণ করা হয় না। আমরা ইহাও মনে করি যে পাপ করিয়া দুই কাহন কড়ি উৎসর্গ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দুই সংস্কারই যার পর নাই ভ্রান্ত ও অহিতকর। চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ খাদ্যা-খাদ্যের বিচার বড় আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তের কলুষনাশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অখাদ্য ভক্ষণে বিরত থাকিলেই যে পাপ স্পর্শ করে না তাহা নয়। সেইরূপ এ কথাও ঠিক যে দেবতার প্রতি প্রকৃত ভক্তিমান না হইয়া দেবমূর্ত্তির নিকট কেবল মাথা হেঁট করিলেই যে পাপ স্পর্শ করে না তাহা নয়। আবার পাপ করিয়া অর্থাৎ চিত্তের বিশুদ্ধতা হারাইয়া পুনরায় চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ না করিয়া কেবল কয়েক কাহন কড়ি উৎসর্গ করিলেই যে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হয় তাহা নয়, এবং শাস্ত্রেও এমন কথা বলে না। অত-এব এই সকল বিষম অনিষ্টকর কুসংস্কার নাশ করা বর্ত্তমান কালে আমাদের সংস্কার কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ সংস্কার প্রতি গৃহে প্রতি দিন শাস্ত্রকথা ও সদুপদেশ দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। অন্য উপায়ে এ সংস্কার সহজে সংসাধিত হইবে না। এ সংস্কার গুরুপুরোহিতাদি দ্বারা হওয়াই উচিত। কিন্তু তাঁহারা এমন যে রূপ অপদার্থ হইয়া

পড়িয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা এ সংস্কার সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে মানুষ পাপপুণ্যের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট দায়ী বা 'জবাবদিহি' করিতে বাধ্য। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পাপপুণ্যের যে অর্থ তাহা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানুষ পাপপুণ্যের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট দায়ী বা 'জবাবদিহি' করিতে বাধ্য নয়। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চিত্ত ও চরিত্রের উন্নতি ভিন্ন পুণ্যের অন্য পুরস্কার নাই এবং চিত্ত ও চরিত্রের অবনতি ভিন্ন পাপের অন্য দণ্ড নাই। পুরণাদিতে স্বর্গভোগ, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি, নক্ষত্রলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি পুণ্যের যে সকল পুরস্কারের কথা আছে এবং নরকভোগ শৃগালযোনিপ্রাপ্তি, কীটযোনিপ্রাপ্তি প্রভৃতি পাপের যে সকল দণ্ডের কথা আছে তাহার প্রকৃত অর্থ চিত্তের উত্তম ও অধম অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় মাত্র। সামান্য ও নিরক্ষর লোকের শিক্ষার্থ তাহা চিত্তের অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে বর্ণিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা চিত্তের অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মানুষ আপন পাপপুণ্যের নিমিত্ত আপনারই নিকট দায়ী। আপন পাপপুণ্যের নিমিত্ত আপনারই নিকট দায়ী করিয়া হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে যত বড় যত মর্য্যাদাবান করিয়াছে অন্য কোন শাস্ত্র তত করে নাই। এই মহত্ব ও মর্য্যাদা মনে করিয়া আপনার নিকট আপন পাপপুণ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে জয়লাভার্থ হিন্দুমাত্রেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পাপপুণ্য সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও অপরাপর শাস্ত্রের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে

পাপপুণ্য মানুষের সকল কাজ সম্বন্ধে হয় না, কতকগুলি কাজ সম্বন্ধেই হয়; খাওয়া পরা ঘুমান বেড়ান প্রভৃতি সম্বন্ধে হয় না, চুরি করা খুন করা মনোকষ্ট দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পাপপুণ্য সকল কাজ সম্বন্ধেই হয়। অপরিমিত ভোজনে পীড়া হয়, পীড়া হইলে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হয়, চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হইলে চিত্তবিকার জন্মে, চিত্তবিকার জন্মিলে মানুষ চরম আদর্শ হইতে দূরে গিয়া পড়ে। অতএব পানভোজনাদির অনিয়ম পাপ এবং পানভোজনাদিতে সংযম পুণ্য। এমন সার ও সুন্দর কথা আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনা যায় না।

আমার বোধ হয় যে আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্যের যে মান, কষ্টি বা standard নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা সহজ ও সুন্দর মান, কষ্টি বা standard অন্য কোন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এক একটী কাজ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে পাপপুণ্য নিরূপণ করিতে হইলে আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট মান বা কষ্টি প্রয়োগ করিলে নিরূপণ কার্য্য যত সহজ হয়, conscience বা বিবেকের মান বা কষ্টিই বল, utility বা উপকারিতার মান বা কষ্টিই বল, Divine Will বা ঈশ্বরেচ্ছার মান বা কষ্টিই বল অন্য কোন মান বা কষ্টি প্রয়োগ করিলে তত সহজ হয় না। Utility বা Divine Will খুঁজিয়া নিরূপণ করিতে হয়। সে অনুসন্ধান বড় জটিল এবং তাহার ফলও সকলের পক্ষে সমান হয় না। কেহ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন কেহ অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু মনের উপর কার্য্যের ফলাফল মনেই অনুভূত হয়। অতএব মনের উপর কার্য্যের ফলাফল দৃষ্টে পাপপুণ্য নিরূপণ করা অতি সহজ। যে কেহ কিছুদিন যত্নসহকারে আপন

মনের উপর আপন কার্য্যের ফলাফল লক্ষ্য করিলে কোন্ কার্য্যে পুণ্য হয় কোন্ কার্য্যে পাপ হয় সহজেই নিরূপণ করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট ।

জন্তু-ধর্ম্মী মানব।

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে বাঙ্গালি বালক "বোধোদয়" হইবামাত্র জানিতে পারে,--যে, মনুষ্য একটি জন্তু-বিশেষ। তাহার পর, আর দশ বৎসর না যাইতেই করুণা-ময়ী ঠাকুরমার প্রসাদে যখন একটি পট্ট-বাস-জড়িত, হরিদ্রা-রঞ্জিত নয় বৎসরের বালা-জন্তু আপনার শয্যা-ভাগিনী রূপে প্রাপ্ত হয়, তখন নরনারীর পশুভাব সে আপনার হাড়ে হাড়ে বুঝিতে থাকে। তাহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-গ্রস্ত যুবা—ডারউইনের মন্ত্রশিষ্য। মনুষ্যের পশুত্ব—এখনত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাজেই স্বদেশী বিদেশী মহামহা পণ্ডিত-গণের নির্দ্দেশ অনুসারে, আর পিতামহীর প্রখর দূতীত্বে, অনেকেই বুঝিয়াছেন, যে আমরা একরূপ জন্তু বিশেষ; আমরা নিতান্তই পশু-ধর্ম্মী। আমরা সেই পুরাণ কথাটা আবার নূতন করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব,—তোমরা কেহ রাগ করিও না; করিলে, আমাদের কথাই প্রতিপন্ন হইবে; রাগ—পশু-ধর্ম্ম। আর রাগই বা করিবে কেন? বালক কাল হইতে উপর্য্যুপরি এত শিক্ষা পাইয়াও, যদি, মনুষ্যের পশুত্বে তোমার সন্দেহ থাকে তবে তোমার গৃহ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রবন্ধ পাঠ করিও, তিনি অবশ্য "বিশেষণে সবিশেষ" তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতেও যদি কিছু সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত একবার দেখা করিও, সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।

জন্তু নানাবিধ ; মনুষ্য-জন্তুও নানাবিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। সকল প্রকার পশু-ধর্ম্মীর বা পক্ষী-ধর্ম্মীর লক্ষণ বুঝাইতে গেলে পুঁথী বেড়ে যায় ; আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব মাত্র। বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকা স্বজন বন্ধু বান্ধবের সহিত জু-বাগানে গিয়া ষ্টকের সহিত আমদানি মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইবেন।

—তত্র পক্ষী-ধর্ম্মী।

প্রথমে, পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ, সর্ব্ব-পরিচিত শুকপক্ষীকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক।

শৌকেয় শ্রেণীস্থ মনুষ্য দেখিলেই বলা যায়। এই শৌকেয় শ্রেণীস্থ লোককেই লোক শৌখীন বলে। কিন্তু শৌখীন না বলিয়া শৌকীন বলিলেই ঠিক ব্যাকরণ-দুরস্ত হয়। ইহাঁদের নাকটি বকফুলের কুঁড়ির মত টীকল, বাঁকাল, ঘোরাল। চোখগুলি ছোট ছোট, কুঁচের মত, যেন মিটি মিটি জ্বলিতেছে। গাটি বেশ চোমরান ; মাথাটি বেশ আঁচড়ান ; সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার রাখিতে ব্যস্ত। প্রায়ই শিকলে বাঁধা আছেন, তখন চাল ছোলা লইয়াই মত্ত ; না হয়, মন্দিরের কোটরে, তখন দেবদেবতার মাথায় নৃত্য করিতেছেন। চিরজীবন শিকলে বাঁধা আছেন, কিন্তু আপনার ভ্রুকুটি ছাড়েন না ; ছোলার খোসা না ফেলিয়া খাইতে পারেন না ; দুধের সর একটু বাসী হইলে, অমনই সেই বাঁকা নাক আরও বাঁকাইয়া বসেন। ইহার নাম শৌকীন বা শৌখীন রুচি।

যে বোল শিখাইয়া দিবে, শৌকীন বাবুরা, দেখিবে, তালে, বেতালে,—সময়ে, অসময়ে, কেবল তাহাই কপ-চাইতেছেন।

রাধাকৃষ্ণই বলুন, আর কালী-কল্পতরুরই নাম করুন, অথবা শিব-জগদ্‌গুরু বলিয়াই চীৎকার করুন,—দেব-দেবতার জ্ঞান ইহাঁদের সকল সময়েই সমান; দেব-দেবতার উপর ভক্তিও সেইরূপ;—ভক্তি করেন, ভাল বাসেন কেবল দাঁড়টি আর ভাঁড়টি। সেই মিটি মিটি কুট্‌কুটে চোখ ছুটি দিয়া ধানটি ছোলাটি অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন; সেই বাঁকা ঠোঁট দিয়া "অপত্য নির্ব্বিশেষে" ছোলাগুলির খোসা ছাড়াইতেছেন; আর নিকটে কেহ আসিলেই, সেই চক্ষুতে একবার আড় চোখে দেখিয়া বলিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণ" "রাধাকৃষ্ণ।" ইহাকেই বলে, শৌকীন বা শৌখীন ভক্তি।

ছেলে পিলে, কাছে গেলে, কঠোর ঠোকরে রক্তপাত করিতে শুকলাল বড় মজবুত। শৌকীন বাবুরা বলেন, যে বালক বালিকার শাসনই গৃহ সংসারের সার ধর্ম্ম; নিকটে বাগে পাইলেই ঠোকর দিবে। আর সবল লোকে ধরিলেই, চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিবে; তখন রাজনীতিজ্ঞরা বলেন, যে চীৎকারই শৌকীন পলিটিক্স। শুকরাজ চিরজীবন শিকল কাটিতেই নিযুক্ত; পরিশ্রম প্রায়ই বৃথা হয়; ক্বচিৎ যদি শিকল কাটা হইল, তাহা হইলে হয়ত নিজে তাহা বুঝিতে পারেন না; কর্ত্তা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ধরিয়া ফেলিলেন, আর শিকলটি খুব মজবুত করিয়া দিলেন। আর না হয়ত, কাটা শিকল পায়ে বাঁধা একবার উড়িয়া গাছে বসিতেই, ডালে জড়াইয়া গেল। আবার ধরিয়া আনিল; অথবা অনাহারে মরিলেন; কিম্বা শিকারীতে মারিয়া ফেলিল। পায়ে শিকল লাগান শৌখীন স্বাধীনতা এই রূপই জানিবে।

শুক-সংবাদের একটি পুরাণ গল্প মনে পড়িল। একজন জুয়াচোর একটি শুক পাখীকে একটি মাত্র বোল শিখাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পাখীটি কেবল মাত্র বলিতে পারিত—"তাহাতে সন্দেহ কি?" একজন ক্রয়ার্থী জিজ্ঞাসা করিল; "এই পাখীটির দাম কত হইবে?" বিক্রেতা বলিল, "পাঁচ শত টাকা; হয়, না হয়, পাখীকেই জিজ্ঞাসা করুন।" ক্রয়ার্থী বলিল, "কেমন, তুতি! তোমার মূল্য অত হইবে কি?" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" লোকটি বিস্মিত হইয়া, পাঁচশত টাকা দিয়াই পাখীটি বাড়ী লইয়া গেল; তাহার পর বুঝিল, যে পাখীটি ঐ একটি মাত্র বোল জানে। তখন একই বোলে কাণ ঝালাপালা হইলে, পাখীর নিকটে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ!" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" ইহা শুনিয়া পক্ষী-ক্রেতা যেমন কপালে ঘা মারিয়া হাস্য করিয়াছিল, আজি আমরাও সেইরূপ কপালে ঘা মারিয়া, সেইরূপ হাসিয়া বলিতেছি—"আমরা এত টাকা দিয়া যে একটি মাত্র বোল কিনিতেছি, আমরা কি নির্ব্বোধ!" ঐ শুন চারিদিক হইতে শৌখীন ভায়ারা এক-জোটে বক্র ঠোঁটে বলিতেছেন,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

এইরূপ কাক, পেচক, কুক্কুট প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী-ধর্ম্মী মানব আছে।

—তত্র পশু-ধর্ম্মী।

পশুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহ-পালিত বিড়াল গৃহীত হইল। বাঙ্গালায় বিড়াল-ধর্ম্মী পুরুষ বিস্তর আছেন; তবে চতুষ্পদ

ও দ্বিপদ বিড়ালে একটু প্রভেদ আছে। চতুষ্পদের এলাকা, অধিকার, ও আবদার,—ভিতর বাড়ীতেই বেশী; আর দ্বিপদের দখল, দাবি, দৌরাত্ম্য—বহির্বাটিতে অধিক। অন্তর বাটিতে দেখিবেন, একটু বেলা হইয়াছে, আর বিড়াল অমনই গৃহিনীর গোলমলে ঠেশ্ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই তাঁহার পদ-যুগলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছে; আর বিনম্র সলোম লাঙ্গুল সঞ্চালনে তাঁহার পদ-সেবা করিতেছে। বাহিরে দেখিবেন, কর্ত্তার দক্ষিণে বামে দুই জন পুরুষ-মার্জ্জার বসিয়া আছেন; একজনের হস্তে 'বঙ্গবাসী'; তিনি মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার চুলকণা গুলি খুঁটিয়া দিতেছেন। চক্রবর্ত্তীর উহাতে বড় আমোদ হয়। অপর দিকে পাল মহাশয় স্বয়ং পাথার বাতাস খাইতেছেন বটে; কিন্তু দূতীর গুণে বীজনী কর্ত্তার দিকেই অভিসারিকা। গৃহস্থ রোমশের লাঙ্গুল-সেবার, আর বহিঃস্থ চক্রবর্ত্তীর চুলকানি খুঁটিতে স্পৃহার, এবং পাল মহাশয়ের পাথার ভঙ্গির—একই কারণ।—সময়ে—কাঁটাটা, গুঁড়াটা; মাছটা, মুড়াটা।

বিড়াল বড় বাস্তু-প্রিয়। বাস্তুতে বস্ত থাকিলে বিড়াল কখন তাহা ছাড়িতে বা ভুলিতে পারে না। থোলের ভিতর পূরে, নানা লাঞ্ছনা করে, উড়ে মালীর মাথায় দিয়া, (বিড়াল কাল তাহার মাছ খাইয়াছিল, তাই তাহার এত ত্যাগস্বীকার) বিড়ালকে গ্রামান্তর করিয়া দিয়া আইস; একদিন পরে দেখিবে বিড়াল শুষ্ক মুখে, রুক্ষ দেহে, একটু ভয়ে, একটু আহ্লাদে, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে অন্তর বাটির গোঁজলা দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। এদিকেও দেখ, চক্রবর্ত্তীকে শত গঞ্জনা দিয়া, নবীন বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চাপাইয়া, বেহারে কন্ট্রাকটের কার্য্য করিতে দেশান্ত-

রিত করা গেল ; দশ দিন পরে দেখিবে চক্রবর্ত্তী, তেমনই শুষ্ক মুখে, রুক্ষ দেহে, বৈটকখানায় উঁকি মারিতেছেন। বলেন, "পটোল নাই, উচ্ছে নাই,—কেবল কাঁকুড়, রাত্রিদিন পেট গড়্ গড়্ করে, সেখানে কি থাকা যায় ?"

বিড়াল বড় বেঁাচা। ঘৃণা পিত্ত নাই বলিলেই হয়। খোকার দুধের বাটিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া, এই মাত্র গৃহিণী তাঁহার সেই দুর্জ্জয়-দমন পাকান বালার বাঘমুখো খোব্‌না দিয়া তাহার খোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু আবার ঐ দেখ—এখনই ফিরিয়া আসিয়াছে ; স্কুলের ছেলেদের পাতের পার্শ্বে জানু গাড়িয়া বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী বরফ খাইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তা কি লাঞ্ছনাই না করেন! সকলেই মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর দশ দিন এ মুখো হবে না,—তা কৈ ? সন্ধ্যার পর সেই সমানে আসিয়া কর্ত্তার পার্শ্বে তেমনই জলযোগ হইল। আহা পেটের দায়ে যাহারা এত নির্ঘৃণ তাহারা চতুষ্পদই হউক, আর দ্বিপদই হউক, কে তাহাদের উপর দয়া না করিবে বল ?

বিড়াল বড় আয়েসী। খাওয়া আর শোয়া—এই দুইটাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। যেটুকু বসিয়া থাকা—তাহা হয়, কেবল খাবার প্রত্যাশায় বা উমেদারীতে ; না হয় আঁচাইবার জন্য। অন্তঃপুরে দেখিবে, এই গ্রীষ্মের দিনে, বিড়াল নীচে তলার নিভৃত ঠাণ্ডা মেজেতে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে ; বহির্বাটিতে দেখিবে, পাল মহাশয় নীচের বৈটকখানার পাশের ঘরে, পাটি বিছাইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতেছেন। শীতকালে দেখিবে, অন্তঃপুরে আধছায়া আধরৌদ্রে শুইয়া বিড়াল লেজ নাড়িতেছে ; বহির্বাটিতে পাল মহাশয়

রৌদ্রে পীঠ দিয়া, তামাকুর অন্ত্যেষ্টি করিতেছেন। হা পেট্! তোমার দায়ে এ হেন বিলাসীকেও ইন্দুরের বিবর পার্শ্বে ওত্ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! তোমার দায়ে পাল মহাশয়কেও পাক করিতে দেখিয়াছি!

বিড়াল ভণ্ড-তপস্বী। রান্নাঘরের বারান্দার কোণে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া চতুষ্পদ বিড়াল কিসের ধ্যান করে, তা কি তোমরা জান না? না, কর্ত্তার জল খাবারের ঘরে গিয়া সন্ধ্যার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিসের আহ্নিক করেন, তাহা তোমরা বুঝ না? তোমরা জানও সব, বুঝও সব; কেবল জাতীয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই না, দ্বিপদে ও চতুষ্পদে প্রভেদ কর। বাস্তবিক পাল চক্রবর্ত্তীর সহিত পুষি, মেনীর কোন প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে কি?

এইরূপ ছাগ, মেষ, শূন, গব প্রভৃতি নানাবিধ-গৃহ-পালিত পশুজাতীয় মানব বঙ্গদেশে যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূতিগন্ধময় পঙ্ক-পল্বল-প্রিয় পুরুষ-শূকরেরও অভাব নাই; নীলীভাণ্ডে পতিত পুরুষ-শৃগালও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। এমন বিচিত্র বিস্তীর্ণ চিড়িয়াখানায় দুই একটি সিংহ শার্দ্দূলও আছে।

—তত্র সর্প-ধর্ম্মী।

সর্প-স্বভাব মানবেরও অভাব নাই। একহারা, লিক্ লিকে ছিপ্ ছিপে চেহারা; সে শরীর যেন কিছুতেই ভাঙ্গেও না, মচ্কায়ও না। গায়ের চামড়া—পাতলা, চিক্কণ ও মসৃণ, অথচ চাকা চাকা দাদে ভরা; হাতের পায়ের নলি সরু সরু; আঁত কখন ভরা থাকে না;—চিরদিনই পাত খোলার মত পড়িয়াই

আছে; চলিবে,—আঁকা; দাঁড়াইবে—ঘাড় বাঁকাইয়া; কথা কহিবে অতি ক্ষীণস্বরে; হাসিবে-একদিকে, এক পাশে একটু খানি; আর যখন চাহিবে—তাহার সেই চাহনীতেই তাহার খলস্বভাবের পূর্ণ প্রতিভাত হইবে। সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, বক্রগতি বিষ-বিদ্যুতের চাহনীতেই বুঝা যায়,সে তাহার অন্তরের অন্তর হইতে কণামাত্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তোমার অন্তরে অমৃত, গরল, যাহাই থাকুক সে সেই বিষ তোমার অন্তরে ইঞ্জেক্ট করিয়া, তোমার পরীক্ষা করিবে। তুমি সংসারের নূতন ব্রতী,—সেই বিষে তোমার শিরা সকল সড়্ সড়্ করিবে, মাথায় মৃদু ঝিম্‌কিনি আসিবে; সেই বিষচক্ষু তোমার অমৃতময় বলিয়া বোধ হইবে, খলের পীরিতি তখন তোমার কাছে সরলের প্রণয় বলিয়া মনে হইবে। আর তুমি সংসারের ঘাগী, সাত হাটের কাণাকড়ি,—সর্পধর্ম্মী মানবের ঐরূপ বিষ-পিচকারী তোমার উপর কতবার হইয়াছে; তুমি ভূক্তভোগী; সেই পরিচিত দৃষ্টিতে তুমি মনে মনে হাসিবে, মনে মনে বলিবে, 'দাদা উহাতে আর আমাদের কিছু হয় না,বহুদিন হইল, আমরা উহার কাটান ঔষধ (antidote) খাইয়া আপ্তসার করিয়া রাখিয়াছি।

খলস্বভাব মানব কখন রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতে পারে না। ঐ অলিতে গলিতে; আশে পাশে; আনাচে কানাচে। সন্ধ্যার পর ইহাদের সখের বিহার, ও সুখের বিচরণ। বিষ-বায়ু-ভক্ষণেই ইহাদের শরীরের পুষ্টি এবং হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। যেখানে কুৎসা, নিন্দা, কলহ, দ্বোষাদ্বেষি, রীষারীষি, সেইখানেই বিষজীবন কোণে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে মহানন্দে ছিন্ন জিহ্বা চুক্ চুক করিতেছে। কিন্তু এক

স্থানে কখনই দুই দণ্ড স্থির থাকিতে পারিবে না। সুড়ি সুড়ি, গুড়ি গুড়ি আসিয়া বসিবে, আর একটু পরেই তেমনই সুড়ি সুড়ি অলক্ষিত ভাবে চলিয়া যাইবে। পথে হাওয়া খাওয়া—তাও তদ্রূপ। পথের ধারে ধারে, প্রাচীরের পাশে পাশে চলিবে। কোথাও গান বাজনা হইতেছে, সেইখানে একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইবে, একবার জানালা দিয়া উঁকি মারিবে, একবার গায়-কের প্রতি সেই তীব্রদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে, সভাস্থ কাহারও সহিত চোখে চোখে হইলে অমনই Good Evening, Babu! বলিয়া সরিয়া পড়িবে। খল কখন মজলিসি হয় না। আবার, কোথাও দীন দুঃখী দিনান্তে দুটি অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেই সময় সর্পধর্ম্মী গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে "দুখী-রাম তোমার বড় মেয়ে মরেছে—সে আজ কতদিন হে?" প্রশ্নকারির উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুখীরামের অর্দ্ধ অন্ন উদরস্থ হইল না। খলের চরিত্র এইরূপ।

বলিহারি, বাইবেলের কবিকে। সয়তানকে সর্পধর্ম্মী করিয়া সংসারের কি গুহ্য কথাই কবিত্বে প্রকাশ করিয়াছেন? খলই সয়তান। চোর, লম্পট, মিথ্যুক, ঘাতুক,—সংসারে শতবিধ পাপী আছে; কিন্তু খলকে পাপী বলিলে হয় না, মহাপাপী বলি-লেও কুলায় না। খল—সয়তান। যে পাপ করে, সেই পাপী; আর যে পাপ হয়, তাহাকে কি পাপী বলিলে বুঝা যায়? সে সয়তান। তোমার ভাল দেখিয়া খল ব্যক্তি যে সকল সময়েই তোমার মন্দ করিবে, এমন কথা নাই; কিছুই করিবে না; পাপের বাহ্যিক কার্য্য কিছুই করিবে না; কিন্তু সে নিজে আপ-

নাকে আপনি পাপে পরিণত করিবে ; পাপের দহনে আপনি দগ্ধ হইতে থাকিবে ; খলের জীবনই এইরূপ।

বাইবেলের কবির বর্ণনা এইরূপ,—যে সয়তান বিশ্ববিধাতার বিরোধী। সে আভা সহিতে পারে না, শোভা দেখিতে পারে না, কোথাও সুখ দেখিলে তাহার কষ্ট হয়। কাজেই সয়তান, এই অনন্ত অজস্র সুখ-প্রস্রবণ সংসারের বিধাতার বিরোধী। কিন্তু বিরোধী হইয়া কি করিবে! সেত তাঁহার মহামহিমা স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং সয়তান স্রষ্টার উপর আক্রোশ করিয়া সৃষ্টির সার মানবের অধঃপতন সাধন করিল ; তোমার চতুস্পার্শস্থ ছোটখাট সয়তানেরা অদ্যাপি দেখ, তাহাই করিতেছে। তোমার কিছু করিতে না পারিলেই, তোমার কৃতিত্ব নষ্ট করিতে ব্যগ্র।

বিধাতার বিচিত্র রহস্যময় সংসারে সর্পধর্ম্মীর সবত্রই গতিবিধি। কোন্ স্থান দিয়া তোমার নন্দনকাননে সে আসা যাওয়া করে, তাহার তুমি কিছুই জান না। তাহার পর তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীকে ভুলাইয়া সে যখন তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তখনই তোমার চমক হয় ও টনক নড়ে। তোমার অধঃপতনেই সর্পধর্ম্মীর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং পরম আহ্লাদ। এই যে রঙে কুট্‌কুটে, চোখে ফুট্‌ফুটে, চেহারায় ছিপ্‌ছিপে, মেজাজে ভিজে ভিজে—মন্থরা দাসী, সন্ধ্যার সময় তোমার গৃহে শয্যা করিতে গিয়া তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীর কাছে দাঁড়াইয়া ফিসি ফিসি প্রত্যহ কি কথা বলে,—উহাকে তুমি কখন বিশ্বাস করিও না। সর্পধর্ম্মিণীদের মত অমন ঘর ভাঙ্গানি আর নাই। সোণার সংসার ছারখার করিয়াই উহাদের আনন্দ; যত শীঘ্র

পার, তোমার নন্দনকানন হইতে ঐ সয়তান সর্পিণীকে দূর করিবে।

সর্পধর্ম্মীর ন্যায়, গোধা, গিরগিটে, ইন্দুর, ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানব আছে।

তুমি নিজে যদি মানবধর্ম্মী মানব হও, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানা তোমার আনন্দের উপবন। উহার বৈচিত্র্যেই তোমার আনন্দ হইবে। টিয়াকে দুটি ছোলা, ময়নাকে একটু ছাতু, বুলবুলিকে একটি তেলাকুচ—বিড়ালকে একখানি কাঁটা, কুক্কুরকে একটু হাড়, হরিণকে দুটি ঘাস—দিতে পারিলেই আরও আনন্দ,—আরও মজা। যথাসাধ্য সকলকেই পালন করিবে; ভবের চিড়িয়াখানায় অমন মজা আর কিছুতে নাই—তবে বাইবেলের কবির উপদেশ কখন ভুলিও না—দুধ দিয়া কখন কালসাপ পুষিও না। খলকে কখন প্রশ্রয় দিও না। সর্পধর্ম্মীর উপর অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া, তুমি তাহাকে পদাঘাতে দূর করিও।

সম্পূর্ণ।